ছোটদের
আরব্য
রজনী

ছোটদের
আরব্য
রজনী
রবিদাস সাহারায়
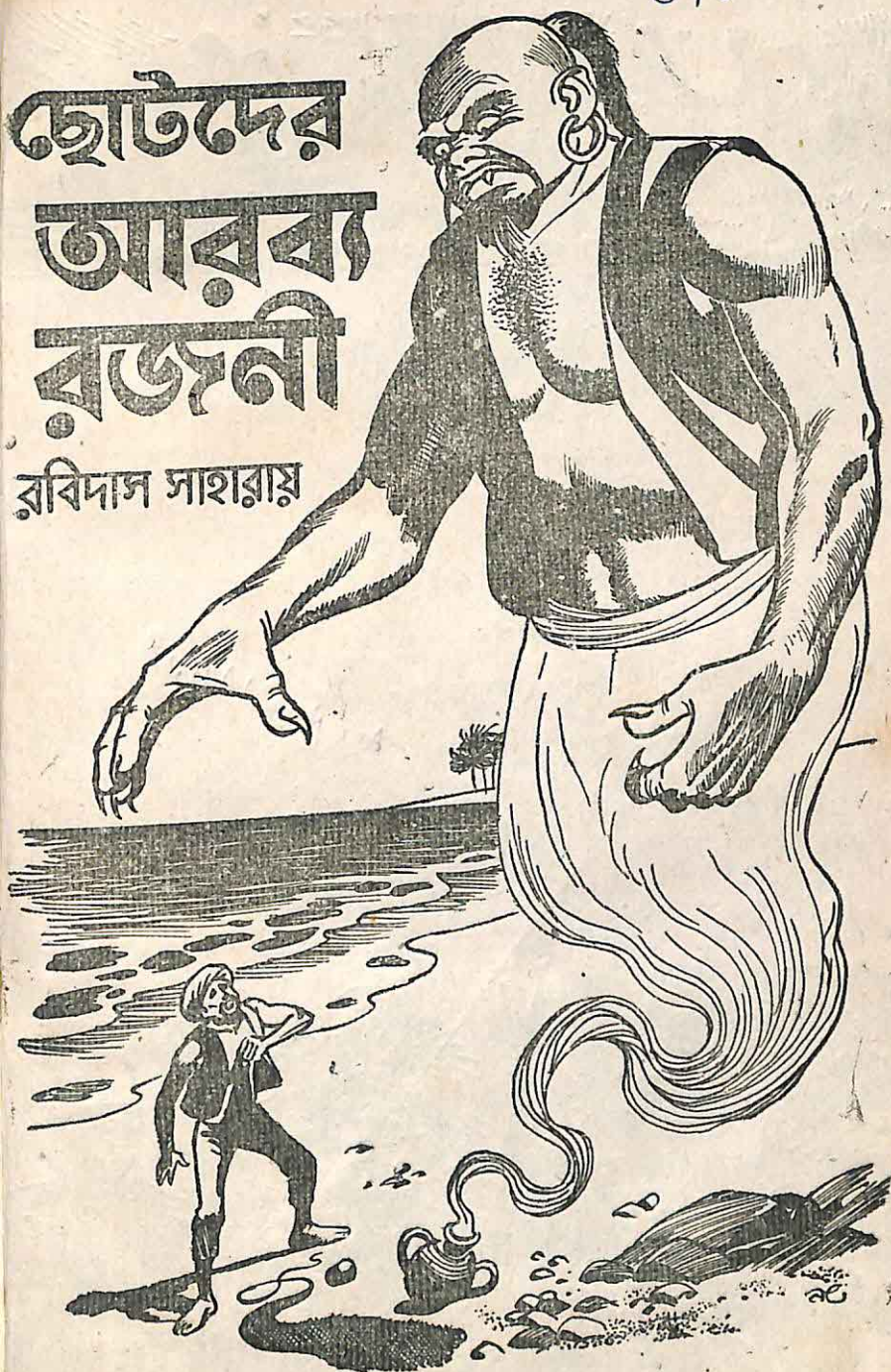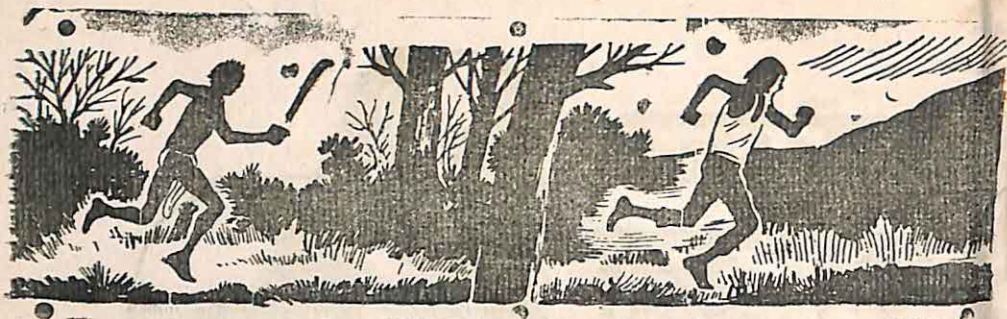
প্রকাশিকা : সুপ্রিয়া পাল * উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর : কল্পতরু প্রেস
৩০ বি, জয়মিত্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৫

চিত্র : নারায়ণ দেবনাথ

পরিচালক : দিব্যদ্যুতি পাল

শোভন মুদ্রণ : মাঘ, ১৩৯২ * ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬

মূল্য : আট টাকা মাত্র
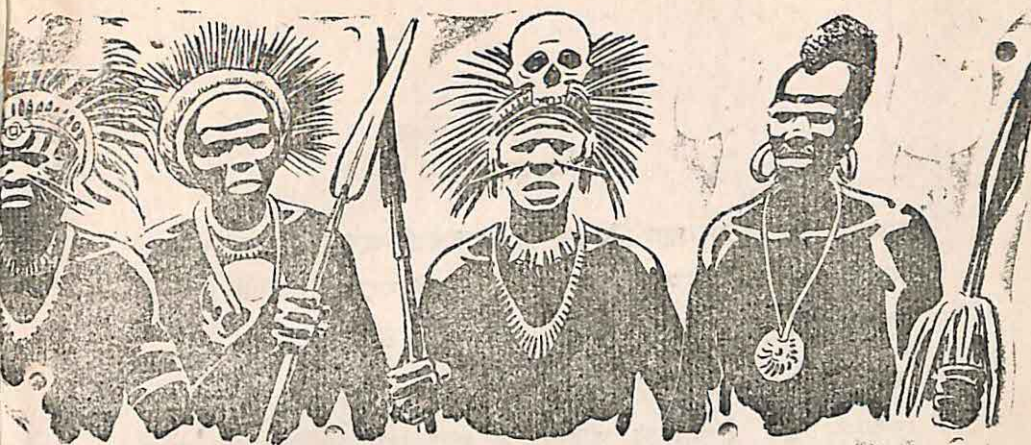
উপহার

....

....

....
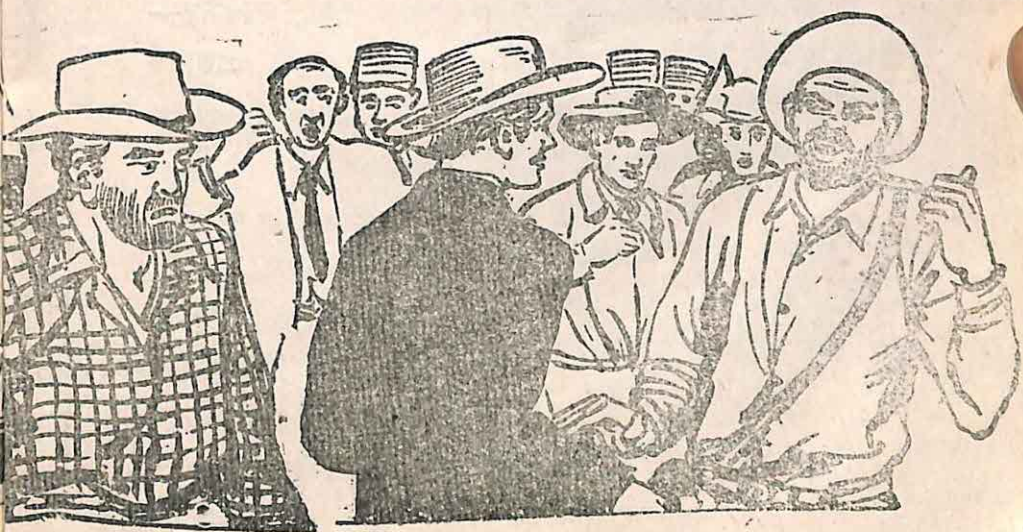
নিবেদন

প্রথমেই বলি, 'আরব্য রজনী'র বেশির ভাগ গল্পই বড়োদের জন্য লিখিত। যে গল্পগুলি ছোট-বড় সবাই পড়তে পারে, সেই কয়েকটি গল্পই একত্রে জুড়ে সম্পাদিত করা হলো এই 'ছোটদের আরব্য রজনী'।

ছোটদের বই প্রকাশ করার দায়িত্ব অনেক। কিরূপ ভাষায় ও ভঙ্গিতে এবং রূপসজ্জায় পরিবেশিত হলে তা ছোটদের মনোরঞ্জন করবে, সে সম্বন্ধে লেখকের এবং সর্বোপরি চিত্রশিল্পী ও প্রকাশকের অবহিত থাকা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় বইয়ের বিষয়-বস্তুর দিকে নজর দেওয়া হয় না—ছবির আড়ম্বরই হয়ে ওঠে প্রধান। আবার অনেক সময় দেখা যায় লেখা ভাল হলেও অন্যান্য দিক থেকে অবহেলিত। এজন্য সার্থক ও মনোরম শিশু ও কিশোর সাহিত্য এদেশে গড়ে ওঠে না।

আমরা সব দিকে দৃষ্টি রেখে "ছোটদের আরব্য রজনী" প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। পাঠকেরা যদি দয়া করে তাঁদের মতামত জানান, তা হলে আমরা খুশী হবো।

বিনীত—
প্রকাশক

বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন শারিয়ার। কিন্তু তাঁর একটি অদ্ভুত খেয়াল ছিল। তিনি প্রতি রাত্রে একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতেন। তারপর রাত-ভোর হবার আগেই জল্লাদ এসে তাঁর দরজায় দাঁড়াতো। রাজা জল্লাদকে হুকুম দিতেন—'বেগমের মাথা কেটে ফেলো।' জল্লাদও সেই হুকুম তামিল করতো।

প্রতি রাত্রে তিনি এই অমানুষিক কাণ্ড করতে লাগলেন। তার ফলে রাজ্যময় হাহাকার পড়ে গেল। ধনী-গরীব সকলেই সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগলো।

মন্ত্রী রাজার জন্য প্রত্যেকদিন একটি করে সুন্দরী মেয়ে যোগাড় করে আনতেন। কিন্তু সেদিন ঘুরে-ঘুরে কোথাও সুন্দরী মেয়ে আর পেলেন না। তখন তাঁর খুব ভয় হলো। মনে-মনে ভাবলেন, আমার আর নিস্তার নেই। রাজা এবার আমারই মুণ্ডু কেটে ফেলবেন।

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে বিষণ্ণ মনে মন্ত্রী বাড়ি ফিরলেন। তাঁর দুই মেয়ে শাহারজাদী আর দুনিয়ারজাদী তখন গল্প করছিল। মন্ত্রীর মলিন মুখ দেখে শাহারজাদী জিজ্ঞেস করলো—বাবা, আজ তোমার মুখ এমন মলিন কেন? কি হয়েছে বলো আমাদের?

মন্ত্রী তখন তাঁর বিপদের কথা মেয়েদের কাছে বললেন। বড় মেয়ে শাহারজাদী ছিলেন যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী। অনেক শাস্ত্রেও তাঁর জ্ঞান ছিল। সব কথা শুনে সে বললো···বাবা, আজ রাত্রে রাজার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও।

মেয়ের কথা শুনে মন্ত্রী শিউরে উঠে বললেন···সর্বনাশ, তোর যে গর্দান যাবে।

শাহারজাদী বললো—যদি গর্দান যায় তবু কোন দুঃখ নেই। আর একটি মেয়ের জীবন তো রক্ষা হবে। আর যদি কোনরকমে আমি বেঁচে যাই, তাহলে হাজার-হাজার মেয়ের জীবন রক্ষা করতে পারবো।

মন্ত্রী দেখলেন, তাঁর সব দিক দিয়েই বিপদ, তাই মেয়ের কথায় তিনি রাজি হলেন। রাজা শারিয়ারের কাছে গিয়ে তিনি বললেন··· জাঁহাপনা, আজ আপনার সঙ্গে আমার সুন্দরী কন্যার বিয়ে দেব।

শারিয়ার সে কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন···সে কি ! আজ ভোর হবার আগেই তোমার মেয়ের ভাগ্যে কি ঘটবে তা জানো ?

মন্ত্রী বললেন···তা জানি। মেয়েও তা জানে। তবু তার বেগম হবার বড় সাধ !

রাজা তখন মন্ত্রীকে তার মেয়েকে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। মন্ত্রী শাহারজাদীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে চললেন রাজপ্রাসাদের দিকে।

শাহারজাদী তার ছোট বোন দুনিয়ারজাদীকেও সঙ্গে নিয়ে চললো। যাবার আগে কয়েকটি কথা বোনকে শিখিয়ে দিল। বললো···আমি যা বলেছি, সেইভাবে কাজ করবি। বুঝলি ?

দুনিয়ারজাদী বললো···আচ্ছা দিদি, তাই হবে।

সেই রাত্রেই রাজা শারিয়ারের সঙ্গে শাহারজাদীর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর রাজা নতুন বেগমের ঘোমটা খুলে ফেললেন। কিন্তু ঘোমটা খুলে দেখলেন তার চোখে জল।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—বেগম, তোমার চোখে জল কেন ?

শাহারজাদী বললো—জাঁহাপনা, আমার একটি ছোট আদরের বোন আছে, তার জন্য আমার প্রাণ কাঁদছে। যদি দয়া করে রাতের মতো তাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে দেন, তাহ'লে খুশী হই।

রাজা তাতে রাজী হলেন। দুনিয়ারজাদীকে তাঁর ঘরে নিয়ে আসা হলো। রাজা-রাণী সোনার খাটে শয়ন করলেন। দুনিয়ারজাদীকে ঘুমুতে দেওয়া হলো অন্য খাটে। কারুর চোখেই কিন্তু ঘুম নেই।

এদিকে ভোর হবার আগেই দুনিয়ারজাদী দিদিকে ঘুম থেকে ডেকে বললো···দিদি ও দিদি. ওঠো !

শাহারজাদী জিজ্ঞেস করলো—আমায় ডাকছিস্ কেন ?

দুনিয়ারজাদী বললো, তুমি যে সুন্দর-সুন্দর গল্প জানো, সেগুলো আমায় বলো, আর তো কোনদিন ঐ রকম গল্প শুনতে পাবো না।

শাহারজাদী তখন রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন···জাঁহাপনা, যদি অনুমতি করেন, তবে আমি আদরের বোনের মনোবাসনা পূরণ করি।

রাজার নিজেও গল্প শোনার খুব লোভ ছিল। তাই বললেন··· অনায়াসে বলতে পারো, আমার কোন আপত্তি নেই।

শাহারজাদী তখন গল্প বলতে আরম্ভ করলো।

* * *

অনেককাল আগে একদেশে এক ধনী সওদাগর বাস করতো। সওদাগর একদিন কোন কাজে ঘোড়ায় চড়ে কোন দূর দেশে যাচ্ছিল। এক বিরাট মরুভূমি পার হয়ে সেই দেশে যেতে হয়। কাজেই সঙ্গে আহার ও পানীয় নিয়ে না গেলে চলে না। সওদাগর একটি ঝুলিতে কিছু রুটি ও খেজুর নিয়ে চললো! অনেক দূরের পথ। সওদাগর মরুভূমি পার হয়ে এসে তাঁর কাজ শেষ করে আবার বাড়ির দিকে রওনা হলো।

তিনদিন পথ চলে চলে রৌদ্রের তাপে তখন সওদাগর খুব ক্লান্ত ও পীড়িত। মরুভূমির এক জায়গায় সে বিশ্রাম করার জন্য ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। ঝুলি থেকে বের করলো রুটি ও খেজুর। খেজুর খেয়ে খেজুরের বিচিগুলো ফেলতে লাগলো এদিকে ওদিকে।

খেয়ে-দেয়ে একটু সুস্থ হয়ে সওদাগর ভাবলো, এবার রওনা হবে। তখন হঠাৎ এক বিরাট দৈত্য তাঁর সামনে দাঁড়ালো। হাতে তার খোলা তলোয়ার। সওদাগরকে ধরে দৈত্যটি বললো—ওরে, তুই বিনাদোষে আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছিস, আমিও তোকে মেরে ফেলবো।

ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে সওদাগর বললো—সেকি, আমি তোমার ছেলেকে মেরেছি ? আমি তো তাকে আজ পর্যন্ত চোখে দেখিনি।

দৈত্য বললো—জানিস্ না, যখন খেজুরের বিচিগুলো তুই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিলি, তখন আমার ছেলে সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। একটা

খেজুরের বিচি পড়ে গিয়েছিল তার চোখের মধ্যে, তাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। কাজেই আজ আর তোর রক্ষা নেই।

দৈত্যের কথা শুনে সওদাগর অবাক। খেজুরের বিচিতে কেউ মরে নাকি? তার মনের ভাব গোপন করে বললো—ওহে দৈত্যরাজ, যদি সত্যই তোমার ছেলের মৃত্যু হয়ে থাকে, সেজন্য আমি দোষী নই। কেন না, আমি ইচ্ছা করে কিছু করিনি। আমাকে ক্ষমা করো।

দৈত্য বললো—না, তা হতে পারে না। আমার ছেলেকে যখন মেরে ফেলেছিস্, তখন আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না—এই বলে সওদাগরকে মাটির ওপর ফেলে বধ করবার জন্য তলোয়ার ওঠালো!

গল্পের এই অবধি যেই বলা হয়েছে, তখনই দেখা গেল, ভোর হয়ে গিয়েছে। রাজা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর রাজসভায় যাবার সময় হয়ে গিয়েছে। এদিকে বেগমের গর্দানও নিতে হবে।

এমন সময় দুনিয়ারজাদী বললো—আহা দিদি, কি সুন্দর গল্প! আরও শুনতে ইচ্ছা করছে।

শাহারজাদী বললো—এটা আর কি সুন্দর। এর চেয়ে অনেক ভালো-ভালো গল্প এর পরে আছে।

তারপর রাজার দিকে তাকিয়ে বললো—জাঁহাপনা, যদি আজ আমাকে বধ না করেন, তাহ'লে আজ রাত্রে এর শেষটুকু বলতে পারি।

রাজার গল্পটি খুব ভাল লেগেছিল। ভাবলেন, রাত্রে শেষটুকু শুনে পরদিন শাহারজাদীকে বধ করবেন।

তাই রাজা বললেন—বেশ, তাই হবে।

শারিয়ার রাজসভায় চলে গেলেন। মন্ত্রী দুরু-দুরু বক্ষে রাজসভায় এসে খোঁজ খবর নিতে লাগলেন জল্লাদ তাঁর মেয়ের মাথা কেটে ফেলেছে কিনা। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, রাজা কোন মেয়ের মাথা কাটাবার হুকুম দেননি। তখন তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

সেদিন রাত হলো। শারিয়ার যথাসময়ে শয়নকক্ষে এসে সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লেন। সেদিনও রাত শেষ হবার আগেই দুনিয়ার-জাদী তার দিদিকে ডেকে বললো—দিদি, ওঠো। গল্পের শেষটুকু
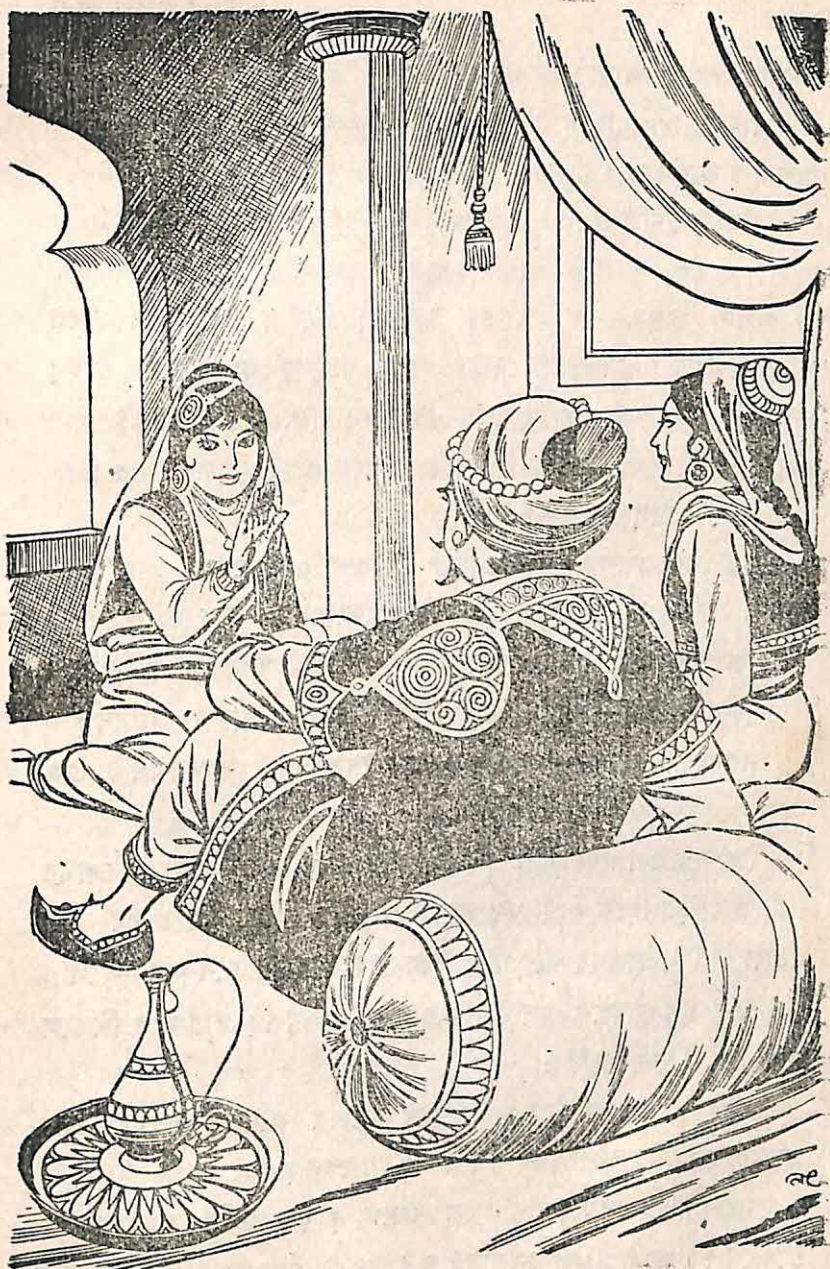
শাহারজাদী রাজাকে গল্প বলছে।

শুনবার জন্য যে আমার মন ছটফট করছে।

শাহারজাদী রাজার দিকে তাকিয়ে বললো—জাঁহাপনা, যদি অনুমতি করেন তবে গল্পের শেষটুকু বলি।

রাজা অনুমতি দিলেন। শাহারজাদী গল্প বলতে শুরু করলো।

* * *

জাঁহাপনা শুনুন, কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! দৈত্য তলোয়ার তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সওদাগর দেখলো তার বাঁচবার কোন আশা নেই! তখন সে কাঁদতে-কাঁদতে বললো—হে দৈত্যরাজ, যদি নিতান্তই বিনা দোষে আমাকে বধ করতে চাও, তবে আমাকে এক বছর সময় দাও।

দৈত্য বললো—কেন?

সওদাগর বললো—আমার কিছু ধন সম্পত্তি আছে। তার বিলি ব্যবস্থা করে, সমস্ত দেনা শোধ করে, ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার এই জায়গায় আসবো। তখন তুমি আমাকে বধ ক'রো।

দৈত্য বললো—বিশ্বাস কি? তুই যদি একবছর পরে না আসিস?

সওদাগর বললো—আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, এক বছর পরে ঠিক এইখানেই আসবো।

দৈত্য সওদাগরের কথায় বিশ্বাস করে তাকে ছেড়ে দিলো। সওদাগর নিজের বাড়ির দিকে যাত্রা করলো। সে কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভোলেনি। একবছর পরে ঠিক দিনে সেই জায়গায় এসে বসে রইলো। কিছুক্ষণ পরে সেখানে এসে উপস্থিত হলো এক বৃদ্ধ! তার সঙ্গে শিকলে বাঁধা একটি সুন্দর হরিণ।

সওদাগরকে দেখে বৃদ্ধ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—সাহেব, এমন ভয়ঙ্কর জায়গায় আপনি একা বসে আছেন কেন?

সওদাগর তখন সব কথা খুলে বললো? বৃদ্ধ তাতে আরো অবাক হয়ে গেল। ভারী মজার ব্যাপার তো! দৈত্য এলে কি হয় তা দেখবার জন্য হরিণটাকে নিয়ে সে দূরে গিয়ে বসে রইলো। অনেকক্ষণ কেটে গেল, দৈত্য আসে না—তারা বসে আছে তো বসেই আছে।

* * *

এদিকে ভোর হয়ে গেল, তবু শাহারজাদীর গল্প শেষ হলো না। সে রাজার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো—জাঁহাপনা, আমাকে যদি আজ হত্যা না করেন, তো আজ রাত্রে আবার গল্পটির বাকিটুকু শোনাব?

ছুনিয়ারজাদী বললো—দিদি, গল্পটি কিন্তু বলতেই হবে।

রাজা শারিয়ারও গল্প শোনার কৌতূহল দমন করতে পারলেন না। বললেন—রাত্রে আবার গল্পটি শুনবো!

সেদিন রাত্রিবেলাতেও সেই ঘটনা ঘটলো। ভোর হবার আগেই ছুনিয়ারজাদী দিদিকে ঘুম থেকে ডেকে বললো—দিদি, গল্প বলবে না?

শাহারজাদী তখন রাজার অনুমতি নিয়ে গল্প বলতে লাগলো।

* * *

দৈত্য আসবে, সওদাগর বসে আছে। কিছুক্ষণ পর আর একজন বৃদ্ধ সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তার সঙ্গে ছু'টি কুচকুচে কালো রঙের কুকুর। সওদাগরের মুখে সব কথা শুনে সে বললো—এতদিন পরেও তুমি কথা ঠিক রেখে যে এসেছ, সেটাই বড় আশ্চর্য। দেখা যাক, তোমার মত সত্যবাদী ও ধর্মপরায়ণ লোককে পাষণ্ড দৈত্য কি করে। তা না দেখে আমি এখান থেকে এক পাও নড়বো না।

সেই বৃদ্ধ তার কুকুর ছু'টি নিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসে রইলো। কিছুক্ষণ পরে আর একজন বৃদ্ধ এসে উপস্থিত হলো, তার সঙ্গে একটা ঘোড়া। সওদাগরকে একা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—মিঞা সাহেব, এমন জায়গায় আপনি একা বসে আছেন কেন?

সওদাগর সব কথা বলতেই সেই বৃদ্ধেরও খুব কৌতূহল হলো! ভারী আশ্চর্য তো! কি হয় তা দেখবে বলে, সেও দূরে বসে রইলো।

কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ কেমন একটা শব্দ হলো। দেখা গেল আকাশে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী খুব যেন জোরে ঘুরছে। তারপরেই এলো প্রবল বেগে ঝড়। সেই ঝড়ে মরুভূমির বালুরাশি এমন ভাবে উড়তে লাগলো, যে মনে হলো চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! ঝড় অল্পক্ষণের মধ্যেই থেমে গেল, ধোঁয়াও অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল বিরাটাকার এক দৈত্য খোলা তলোয়ার

হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দৈত্য সওদাগরের একটা হাত টেনে ধরে তার মাথা কাটবার জন্য তলোয়ার উঠলো।

সওদাগর চীৎকার করে বলতে লাগলো—হে খোদা, রক্ষা করো!

তা দেখে বৃদ্ধ তিনজনের মনে খুব দয়া হলো। প্রথম বৃদ্ধ বললো—হে দৈত্য, তুমি ক্ষান্ত হও। প্রথমে আমার ও আমার হরিণীর কাহিনী শোন। যদি তোমার ভাল লাগে, তা'হলে এই সওদাগরের এক তৃতীয়াংশ অপরাধ মার্জনা ক'রো।

দৈত্য সে-কথা শুনে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো—বেশ, গল্প শুনে যদি ভাল লাগে, তবে তোমার কথা মতো কাজ করবো।

বৃদ্ধ বললো—তবে শোন। আমার সঙ্গে এই যে হরিণীটি আছে, এটি সত্য-সত্য হরিণী নয়, আমার স্ত্রী। আমি একজন ধনীর ছেলে। এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে আমি বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু কোন সন্তান না হওয়ায় আর একটি মেয়েকে বিয়ে করলাম। সেই মেয়ের কোল আলো করে একটি সুন্দর ছেলে হলো। দিনে-দিনে ছেলেটি বড় হতে লাগলো। একদিন ভাবলাম, তীর্থে যাবো। বড় বউয়ের উপর আমার ছেলে ও তার মায়ের দেখাশোনার ভার দিয়ে শুভদিন দেখে বেরিয়ে পড়লাম। আমি যাবার কিছুদিন পরেই আমার বড় বউ যাদুবিদ্যা দিয়ে আমার ছেলেকে একটি বাছুর ও তার মা'কে একটি গরু করে ফেললো। তারপর এক গো-রক্ষকের কাছে তাদের বিক্রি করে দিয়ে বললো—গরু ও বাছুরকে খুব যত্ন করে রাখতে।

এক বছর পরে বাড়ি ফিরে এসে আমার ছেলে ও বউকে দেখতে পেলাম না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—তারা কোথায়?

বড় বউ মায়া কান্না কেঁদে বললো—হায়! তুমি যাবার কিছুদিন পরে ছোট বউ মারা গেল। তারপর ছেলেটি বিবাগী হয়ে কোথায় চলে গেল, কোথাও তাকে খুঁজে পাইনি!

আমিও মনের দুঃখে কাঁদলাম, তারপর নানা দেশে ছেলের খোঁজ করলাম, কিন্তু কোথাও পেলাম না।

কিছুদিন পর আমাদের ঈদের পর্ব এলো। তখন ভালো দেখে

একটি গরু কোরবানি করবার জন্য গো-রক্ষককে খবর দিলাম। গো-রক্ষক একটি মনোমত গরু এনে দিল। গরুটিকে বধ করিবার জন্য আমি ভোজালি ওঠলাম। কিন্তু গরুটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কাতর-ভাবে ডাকতে লাগলো। তাতে আমার মনে খুব দয়া হলো! ভাবলাম এটাকে হত্যা করবো না। কিন্তু আমার স্ত্রী বললো—এ'রকম সুলক্ষণা গাভী আর পাবে না। এটাকেই বধ করো।

স্ত্রী'র কথায় ওই গরুটাকে বধ করলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গরুটি কেটে দেখলাম, তার ভেতরে মাংস নেই, শুধু হাড়। তখন গো-রক্ষককে অন্য একটি বাছুর নিয়ে এলো। সেটা যে আমারই ছেলে, তা আমি জানতাম না। পরে আমি বুঝতে লারলাম।

বাছুরটি হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে আমার পায়ের উপর এসে করুণ আর্তনাদ করতে লাগলো। তখন ওটিকে বধ করতে আমার ইচ্ছা হলো না। ওদিকে আমার স্ত্রী বারবার বলতে লাগলো—ওটাকেই বধ করো। এমন ভালো বাছুর আর পাবে না।

কিন্তু ঐ বাছুরটিকে বধ করলাম না। গো-রক্ষককে বলে অন্য একটি গরু এনে কোরবানি করলাম। ঈদের পর্ব শেষ হয়ে গেল। পরদিন ভোরবেলা গো-রক্ষক আমার বাড়িতে এসে হাজির। হন্তদন্ত হয়ে বললো—হুজুর, একটি আশ্চর্য খবর আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কি আশ্চর্য খবর?

গো-রক্ষক বললো—আমার এক মেয়ে মায়াবিদ্যা জানে। যে বাছুরটি কাল আপনি ফেরৎ দিয়েছেন, আমার মেয়ে বাছুরটিকে দেখে প্রথমে হেসে পরে কাঁদতে লাগলো। আমি তার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। মেয়ে বললো—আমি হেসেছি, কারণ এই বাছুরটি আমাদের গাঁয়েরই এক ছেলে আর কেঁদেছি, কারণ এর মা কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছে।

গোরক্ষকের কথা শুনে আমি ভয়ানক অবাক হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম, আমার ছেলে আর বউয়ের ঐ দশা হয়েছে। এমন সময় গোরক্ষকের মেয়েও সেখানে এসে হাজির। আমি বললাম—তুমি যদি

আমার ছেলেকে মানুষ করতে পার, তা'হলে তোমাকে আমি সর্বস্ব দেবো।

মেয়েটি বললো—আমি তা করে দেবো, কিন্তু আমার দু'টি শর্ত আপনাকে পূরণ করতে হবে। প্রথম শর্ত—আপনার ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত—এই কাণ্ড যে করেছে, তাকে আমি নিজের হাতে সাজা দেবো।

আমি তাতে রাজী হলাম। মেয়েটি মন্ত্র-পড়া জল ছিটিয়ে আমার ছেলেকে মানুষ করে দিল, তারপর মন্ত্র দিয়ে আমার বড় বউকে হরিণী করে দিল। এটাই সেই হরিণী। কিন্তু আমার ভাগ্য খারাপ! কিছুকাল পরে আমার বউও মারা গেল, ছেলেটিও মনের দুঃখে দেশ ছেড়ে চলে গেল। আমি আজও সেই ছেলেটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কেমন দৈত্য, এখন বলো, আমার এই কাহিনী আশ্চর্য কিনা।

দৈত্য বললো—হ্যাঁ, আশ্চর্যই বটে। আমি তোমার কথায় সওদাগরের এক-তৃতীয়াংশ অপরাধ ক্ষমা করলাম।

দৈত্যের কথা শুনে দ্বিতীয় বৃদ্ধ বললো—ওহে দৈত্য, আমার এই কুকুর দু'টির ঘটনা আরও আশ্চর্যজনক। যদি শোনো, তাহলে বলি।

দৈত্য বললো—যদি আশ্চর্য হয়, তবে সওদাগরের আর এক তৃতীয়াংশ ভাগ অপরাধ মার্জনা করবো!

দ্বিতীয় বৃদ্ধ বললো—ওহে দৈত্য, এই যে দু'টো কুকুর দেখছো, এরা দু'জনেই আমার বড় ভাই। আমাদের বাবা মারা যাওয়ার পর আমরা তিনজনেই এক-এক হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা করতে লাগলাম।

আমার বড় দুই ভাই চলে গেলেন অনেক দূর দেশে, সেখানে গিয়ে ব্যবসা করতে লাগলেন। প্রায় এক বছর পরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। একজন জীর্ণ-শী ভিক্ষুক এসে দাঁড়ালো আমার দোকানের সামনে। আমি কিছুক্ষণ সেই ভিক্ষুকের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলাম, তিনিই আমার বড় ভাই। তখন তাঁকে আদর করে দোকানে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—দাদা, তোমার এই দশা কেন?

দাদা বললেন—ব্যবসা করে আমার সব টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমার পেট ভরে খাবার জোটে না।

তখন আমি দাদাকে ভাল করে খাওয়ালাম। তারপর নিজের থেকে এক হাজার টাকা দিয়ে বললাম--তুমি এখানেই ব্যবসা করো।

আমার মেজদাদাও কিছুদিন পরে টাকা-পয়সা নষ্ট করে ফকির হয়ে ফিরে এলেন। তাঁকেও আবার ব্যবসা করার জন্য এক হাজার টাকা দিয়ে দিলাম। দু'জনেই তখন সেখানো থেকে ব্যবসা করতে লাগলেন।

কিন্তু এক জায়গায় বসে ব্যবসা করতে তাঁদের ভাল লাগলো না। কিছুকাল পরে দু'জনেই দূর দেশে বাণিজ্য করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমাকেও নিতে চাইলেন তাঁদের সঙ্গে। আমার কিন্তু বিদেশে যেতে ইচ্ছা হলো না। বললাম---যদি সকলকে আবার সর্বস্বান্ত হতে হয়, তাহ'লে কি হবে?

তখন তারা চুপচাপ হইলেন। এরপর পাঁচ বছর কেটে গেল। আমি এখানে ব্যবসা করে আরও অনেক টাকা লাভ করলাম।

তাঁরা কিন্তু বিদেশে যাবার জন্য তখনও পাগল। অবশেষে তাঁদের বার চার অনুরোধে আমাকে তাঁদের সঙ্গে বাণিজ্যে যেতে হলো। হিসাব করে দেখলাম, আমার ছয় হাজার টাকা ঘরে আছে। ভাইদের বললাম, তিন হাজার ঘরে রাখি আর তিন হাজার টাকা নিয়ে যাত্রা করি। কারণ যদি বাণিজ্যে আমাদের সুবিধা না হয় তাহ'লে ফিরে এসে ঐ টাকা দিয়ে আমরা বাকি জীবন চালাতে পারবো।

তাতে কেউ আপত্তি করলো না না। সব ব্যবস্থা ঠিক করে আমরা জাহাজে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় এক ঘটনা ঘটলো। এক ভিখারিণী আমার কাছে এসে বললে—আমাকে দয়া করে সঙ্গে নিন। ভবিষ্যতে আমাকে দিয়ে আপনার উপকার হবে।

দাদারা আমাকে বললেন—সাবধান, ওর কথা শুনবি না।

কিন্তু কেন জানিনা, ভিখারিণীর প্রতি আমার দয়া হল। আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে জাহাজে উঠলাম।

আমার দাদারা কিন্তু এই ব্যাপারে খুব খুশী হলেন না।

একদিন রাত্রে যখন আমি ও সেই মেয়েটি ঘুমিয়ে আছি, তখন দাদাদের মনে দুষ্ট বুদ্ধি চাপলো। তাঁরা আমাদের দু'জনকে সমুদ্রের

জলে ফেলে দিলেন। জলে পড়তেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমি চীৎকার করে উঠলাম। কিন্তু ভিখারিণী মেয়েটি বললো—ভয় নেই !

তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটলো। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ পরী-মূর্তি ধারণ করে আমাকে শূন্যে উঠিয়ে একটি দ্বীপে নিয়ে গেল।

পরী বললে—আমি জানতাম, পথে তোমার বিপদ হবে। তুমি খুবই সৎলোক, ভগবান তাই সবসময় তোমাদের সহায় থাকেন। তাই তোমাকে রক্ষা করবার জন্য আমি ছদ্মবেশে তোমার কাছে গিয়েছিলাম।

আমি মনে-মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। পরী বললো—তোমার ভাই ছু'টি খুবই দুষ্টলোক। তাঁদের আমি নিজেই সাজা দেবো।

আমি বললাম—যা-ই করো তাঁদের প্রাণে মেরো না, কারণ তাঁরা আমার নিজের ভাই।

পরী তখন আমাকে আবার আকাশ পথে উড়িয়ে নিয়ে আমার বাড়ীর সামনে নামিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল দেখতে পেলাম না।

কিছুক্ষণ আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ভাবছিলাম, যে তিন হাজার টাকা ঘরে আছে তা দিয়ে ব্যবসা করবো। এমন সময় এই কুকুর ছু'টি কাতরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

সেই মুহূর্তে পরীও এসে হাজির। বললো—এই কুকুর ছু'টি তোমার দুষ্ট ছু'টি ভাই। তাদের কর্মফলের জন্য তাদের আমি এই শাস্তি দিয়েছি। দশ বছর পরে তারা আবার মানুষ হবে।

এত দিনে সেই দশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। আর আমিও সেই পরীর খোঁজে বেরিয়েছি। পথে এই সওদাগরের সঙ্গে দেখা হওয়াতে বড় কৌতূহল হলো, তার ভাগ্যে কি ঘটে তাই দেখবার জন্য এখানে বসে আছি। কেমন, আমার ঘটনা শুনে আশ্চর্য মনে হলো তো ?

দৈত্য বললে—হ্যাঁ, আশ্চর্যই বটে। কাজেই সওদাগরের আরও একের তৃতীয়াংশ অপরাধ আমি মার্জনা করলাম।

এমন সময় তৃতীয় বৃদ্ধ কাছে এগিয়ে এসে বললে—ওহে দৈত্য, আমি এবার আমার এই ঘোড়ার কাহিনী বলতে চাই ! যদি তোমার ভাল লাগে, তবে এই সওদাগরের বাকী দোষটুকু ক্ষমা করবে তো ?

দৈত্য বললো—হ্যাঁ, ক্ষমা করবো। তোমার গল্প শুরু করো।

তৃতীয় বৃদ্ধ বলতে লাগলো—হে দৈত্য, আমার পাশে যে ঘোড়াটি দেখছো, এটা সত্যি ঘোড়া নয়, আমার স্ত্রী। আমি একসময়ে দূর দেশে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী ছিল তুষ্ট প্রকৃতির আমার সঙ্গে মাঝে-মাঝেই ঝগড়া করতো। বিদেশ থেকে ফিরে আসতেই সে আমাকে জাদুবিদ্যা দিয়ে কুকুর করে ফেললো। আমিও প্রাণের ভয়ে ছুটে পালালাম।

একটি কসাইখানার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় কসাইয়ের এক মেয়ে আমাকে দেখতে পেল। সে কি করে বুঝতে পারলো আমি কুকুর নই। মেয়েটি জাদুবিদ্যা জানতো, সেই বিদ্যায় আমাকে সে আবার মানুষ করে দিলো। পরে মেয়েটি আমাকে একপাত্র মন্ত্রপড়া জল দিয়ে বললো—তোমার এমন অবস্থা যে করেছে, তার গায়ে এই জল ছিটিয়ে দিও। তখন যা তাকে হতে বলবে, সে তাই হবে।

আমি বাড়িতে এসেই স্ত্রীর গায়ে সেই জল ছিটিয়ে দিয়ে বললাম—তুমি ঘোড়া হও। সঙ্গে-সঙ্গে সে ঘোড়া হয়ে গেল ; কিন্তু কি ভাবে তাকে আবার মানুষ করবো তা জানি না। তাই সেই কসাইয়ের মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কেমন, আমার কাহিনীটি ভালো তো ?

দৈত্য বললো—হ্যাঁ, ভালো। এই সওদাগরের সমস্ত দোষ আমি ক্ষমা করলাম। তোমরা তিনজনে এর প্রাণরক্ষা করলে, নইলে এতক্ষণে এর গর্দান যেতো।

মুহূর্তের মধ্যে দৈত্য অদৃশ্য হয়ে গেল। মুক্তি পেয়ে সওদাগরের কি আনন্দ ! তিন বৃদ্ধকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো।

শাহারজাদীর গল্প শুনে তুনিয়ারজাদী বললো—আঃ দিদি, কি চমৎকার গল্প !

শাহারজাদী বললো—জেলে ও দৈত্যের গল্প এর চেয়েও চমৎকার।

তুনিয়ারজাদী কিছু বলবার আগেই রাজা শারিয়ার জিজ্ঞেস করলেন—সেই গল্প কি রকম ?

শাহারজাদী বললো—এখন তো ভোর হয়ে গিয়েছে। যদি অনুমতি

দেন, তবে আজ রাতে গল্পটি বলবো।

শারিয়ার বললেন—বেশ তাই হবে। আজও তোমার গর্দান নেওয়া হলো না। এই বলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

আবার রাত হলো। আবার ভোর হবার আগেই শুরু হলো গল্প।

* * *

অনেককাল আগে এক গরীব জেলে তার বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে সমুদ্রের তীরে বাস করতো। অতি কষ্টে তাদের দিন চলতো।

একদিন সমুদ্রে কয়েকবার জাল ফেলেও সে কোন মাছ পেলো না। তাতে তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। যাবার আগে শেষবারের মত জাল ফেললো। এবার তার জালে উঠলো একটা তামার কলসী। জেলে ভাবলো, এই কলসীটি বিক্রি করে যা পাওয়া যায় তাতেই কোন রকমে দিন চালাবে। কলসীটি ছিল খুব ভারী, তার উপর মুখটি ছিল ঢাকনা দিয়ে আঁটা। জেলে ভাবলো, ভিতরে হয়তো মণিমুক্তা কিছু আছে। তাই সে ঢাকনাটি খুলে ফেললো।

কিন্তু কি আশ্চর্য! কলসীর ভেতর থেকে প্রথমে ভয়ানক ধোঁয়া হতে লাগলো। সেই ধোঁয়া প্রথমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আবার কুণ্ডলী পাকাতে লাগলো। তারপর দেখা গেল—সেই থেকে বেরিয়ে আসছে এক দৈত্য। জেলে তা দেখে ভয় পেয়ে গেল।

কিন্তু ওকি! দৈত্য জেলের কাছে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললো,—প্রভু সোলেমান, আমাকে ক্ষমা করুন। আর কখনো আপনার অবাধ্য হবো না। আমি চিরদিন আপনার ভৃত্য হয়ে থাকবো।

জেলে দৈত্যের ওই কথা শুনে অবাক। বুকে তার সাহস হলো। তাই জোর গলায় বললো—ওরে মূর্খ, তুই কি জানিস না যে, সোলেমান দু' হাজার বছর আগে মারা গিয়েছেন ? তুই কে ? এই কলসীর ভিতর কেমন করে গেলি ?

দৈত্য জেলের কথায় ভয়ানক রেগে উঠে বললো—তুই বড় অভদ্র। ভালভাবে কথা বল্—নইলে এখনই গলা টিপে তোকে মেরে ফেলবো।

জেলে তখন ভয় পেল। তাই শান্ত ও ভদ্রভাবে বললো—তোমার

প্রাণরক্ষা করলাম বলেই কি এই পুরস্কার ?

দৈত্য বললো—হ্যাঁ, তোকে মরতেই হবে। আমার কাহিনী আগে শোন্, তারপর কি ভাবে মরতে চাস বল্।

দৈত্য বলতে লাগলো—সোলোমান বাদশাহের সময়ে আমি শক্তিশালী দৈত্যদের দলপতি ছিলাম! সেই সময়ে বাদশাহ কোন একটা কাজে আমার ওপর খুব রেগে গেলেন। তারপর এই কলসীর মধ্যে আবদ্ধ করে আমাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন। সেই সময়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, একশো বছরের মধ্যে যে আমাকে উদ্ধার করবে তাকে আমি প্রচুর ধন-রত্ন দেবো। কিন্তু একশো বছর পার হয়ে গেল, কেউ আমাকে উদ্ধার করলো না। তখন প্রতিজ্ঞা করলাম, দু'শো বছরের মধ্যে যে আমাকে উদ্ধার করবে তাকে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য দান করবো। কিন্তু কেউ আমাকে উদ্ধার করলো না। তখন আমি ভয়ানক রেগে গেলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, এরপর যে আমাকে উদ্ধার করবে তাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড দেবো। এখন সেই সময় উপস্থিত। তুই কি ভাবে মরতে চাস্ বল্ ?

জেলে তখন বুঝতে পারলো দৈত্যের হাত থেকে তার নিস্তার নেই। তাই বাঁচবার শেষ চেষ্টা করে বললো—হে দৈত্য, আমার একটি প্রশ্ন আছে, দয়া করে তার জবাব দাও।

দৈত্য জিজ্ঞেস করলো—কি প্রশ্ন ?

জেলে বললে—তুমি কি ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পারো যে, এই ছোটো কলসীর মধ্যে সত্যি তুমি ছিলে ?

দৈত্য বললো—হ্যাঁ, আমি শপথ করে বলছি, এই কলসীর মধ্যেই আমি ছিলাম।

জেলে বললো—অসম্ভব, আমি চোখে না দেখলে কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারি না।

দৈত্য সে কথা শুনে খুব রেগে উঠে বললো—ওরে মূর্খ, তাই দেখতে চাস্। তবে এই দেখ্।

বলতে-বলতে দৈত্য আবার ধোঁয়া হয়ে কলসীর মধ্যে ঢুকে গেল।

জেলে তখনি তাড়াতাড়ি কলসীর ঢাকনাটা বন্ধ করে বললো;—ওরে দৈত্য, এবার আমার পালা। তোকে কে রক্ষা করবে, সমুদ্রের এমন জায়গায় তোকে ফেলবো, যাতে কেউ কখনও উদ্ধার করতে না পারে।

দৈত্য দেখলো মহা বিপদ। তখন সে ভিতর থেকেই কাতর কণ্ঠে বললো—ওহে জেলে ভাই, তুমি কি ঠাট্টা বুঝলে না? সত্যিই কি তোমাকে আমি মেরে ফেলতাম?

জেলে বললো—তোর মত অকৃতজ্ঞকে বিশ্বাস করতে নেই। যদি বিশ্বাস করি, তাহলে গ্রীক সম্রাট জুনান তাঁর প্রাণদাতা চিকিৎসক দোবানের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছিলেন ঠিক সেইরূপ হবে।

দৈত্য জিজ্ঞেস করলে—তা কি রকম?

জেলে বললো—তা হলে শোন। অনেককাল আগে কোন এক দেশের সম্রাট ছিলেন জুনান। তিনি খুব জ্ঞানী ও ক্ষমতাশালী ছিলেন।

একবার তাঁর ভয়ানক অসুখ হলো। অনেক চিকিৎসা করেও কোন ফল হলো না। কিছুকাল পরে 'দোবান' নামে একজন হাকিম রাজসভায় এসে জুনানকে বললেন—সম্রাট, আপনার কঠিন অসুখের কথা শুনে আমি এসেছি। যদি অনুমতি দেন, তাহলে আপনার চিকিৎসা আমি করতে পারি।

জুনান বললেন—যদি আপনি আমার রোগ আরোগ্য করতে পারেন, তা'হলে আপনাকে এমন পুরস্কার দেবো, যে আপনার বংশে কখনো কারুর কোন দিন অভাব হবে না।

দোবান সে কথা শুনে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। পরের দিন একটি মুদগর ও নানাবিধ ঔষুধ দিয়ে ভরা একটি গোলা তৈরি করে এনে সম্রাটকে দিয়ে বললেন—আপনি ঘোড়ায় চড়ে মুদগর দিয়ে এই গোলায় আঘাত করতে করতে ঘোড়া চালাতে থাকবেন। যখন আপনার শরীর ঘামে ভিজে উঠবে, তখন ঘরে এসে স্নান করে শুয়ে পড়বেন। পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখবেন যে আপনার শরীরে রোগের কোন চিহ্ন নেই।

দোবানের কথামত সম্রাট সবকিছু করে রাত্রিবেলায় ঘরে ফিরে

স্নান করে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, সত্যিই তাঁর শরীরে কোন রোগ নেই। তখন রাজসভায় এসে দোবানকে ডেকে পাঠালেন। দোবান আসতেই তাঁকে অনেক ধনরত্ন পুরস্কার দিলেন।

এরপরও সম্রাট ঘোষণা করলেন, দোবানকে নিয়মিত মাসোহারা দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, তাঁকে পরিষদ রূপেও রাজসভায় বসার স্থানও করে দিলেন। তাতে সম্রাটের মন্ত্রীর ভয়ানক হিংসা হলো। তিনি দোবানের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কথা বলে বেড়াতে লাগলেন। তাতে সম্রাটের মনে নানারকম সন্দেহ জাগতে লাগলো। তিনি ধীরে-ধীরে দোবানকে অবিশ্বাস করতে লাগলেন।

মন্ত্রী একদিন সুযোগ বুঝে জুনানের কাছে গিয়ে বললেন—সম্রাট, অপরিচিতকে এত প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। দোবান আপনাকে সবংশে নিধন করবার ষড়যন্ত্র করছে।

সম্রাট বিস্মিতভাবে বললেন—সে কি কথা! যে আমার জীবন দান করেছে, সে আমাকে নিধন করবার চেষ্টা করবে কেন? তুমি বোধহয় হিংসায় এরূপ কথা বলছো।

মন্ত্রী বললেন—না সম্রাট! ঐ চিকিৎসক একজন শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। আপনি তার চিকিৎসায় যেমন তাড়াতাড়ি আরাম পেয়েছেন, তেমনি তাড়াতাড়িই সবংশে নিধন হবেন।

একই লোকের বিরুদ্ধে প্রতিদিন অভিযোগ শুনতে-শুনতে সম্রাট মনে করলেন, দোবান সত্যসত্যই দোষী, তার শাস্তি দরকার। তাই জরুরী খবর পাঠিয়ে দোবানকে রাজসভায় হাজির হতে নির্দেশ দিলেন।

দোবান রাজসভায় এসে হাজির হতেই সম্রাট বললেন—আমি জানতে পেরেছি, আপনি শত্রুপক্ষীয় গুপ্তচর এবং আমাকে গোপনে হত্যা করাই আপনার উদ্দেশ্য। সেই অপরাধে আপনার প্রাণদণ্ড হবে।

দোবান সে-কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—সম্রাট, আপনি ন্যায় বিচার করবেন। যদি আমি সত্যই দোষী হয়ে থাকি তবেই আমাকে শাস্তি দিবেন।

সম্রাট বললেন—হ্যাঁ, আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত। যে রাজদ্রোহী,

তার একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু। তাই আপনার গর্দান নেওয়া হবে।

দোবান দুঃখে ও হতাশায় ভেঙে পড়লেন। তারপর বললেন—সম্রাট! আপনাকে অসুখ হতে আরোগ্য করার এই কি পুরস্কার? যা হোক, আমাকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শেষ দেখা করে আসবার সময় দিন। তা ছাড়া চিকিৎসা বিষয়ে আমার দামী-দামী অনেক বই আছে। সেগুলোর একটা ব্যবস্থা করে আমি আসতে চাই।

সম্রাট রাজী হতেই দোবান বললেন—আমার একখানি অতি দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য গ্রন্থ আছে, সেটি আপনাকে উপহার দিতে চাই।

সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন—ঐ গ্রন্থে কি আছে?

দোবান বললেন—অনেক আশ্চর্য বিষয় তাতে লেখা আছে। তার মধ্যে একটি সামান্য ঘটনার বিষয় বলছি। যখন আমার মুণ্ড কাটা হবে তখন সেই বইয়ের ছয়ের পাতায় তৃতীয় লাইনে যা লেখা আছে, তা পড়ে আমার কাটা মুণ্ডকে যে প্রশ্ন জিগ্যেস করবেন, কাটা মুণ্ডই সেই প্রশ্নেই জবাব দেবে।

সেই ব্যবস্থাই করা হলো। নগরে খবর রটে গেল—কাটামুণ্ড কথা বলবে। পরদিন ভোর হতেই দলে-দলে প্রচুর লোক বধ্যভূমিতে এসে জড়ো হতে লাগলো।

অনেকে ভাবলো, দোবান হয়তো আসবেন না। কিন্তু তিনি ঠিক সময়েই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে সেই দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য বইটি।

দোবান বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে বললে—সম্রাট, আমার বিষয়ে আবার একটু বিবেচনা করে দেখুন। আমি সত্যিই নির্দোষ।

মন্ত্রী সম্রাটের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন…শত্রুকে বেশীক্ষণ বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়। শীগগীর ওর মুণ্ড কাটার হুকুম দিন।

সম্রাট জল্লাদকে প্রস্তুত হতে বললেন। দোবান সেই পুস্তকটি সম্রাটের হাতে দিলেন। একটি কাঠের তেপায়ার উপর এক টুকরা কাপড় পেতে পাশে একপাত্র মন্ত্রপড়া জল রেখে বললেন—সম্রাট, আমার কাটা মুণ্ডটি এই কাপড়ের উপর রাখবেন। তারপর বইয়ের

সেই পাতাটি পড়ে মুণ্ডকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

সম্রাটের আদেশে তখনই দোবানের মুণ্ড কাটা হলো। মুণ্ডটি রাখা হলো সেই কাপড়ের উপর। সম্রাট বই খুললেন, কিন্তু দেখলেন সব পাতাই জোড়া। তখন তিনি জিভ থেকে আঙ্গুলে থুতু নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা খুলতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলেন সব পাতাই সাদা, কিছুই তাতে লেখা নেই। সম্রাট মুণ্ডকে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় সেই লেখা ?

মুণ্ড বললো—আরও খুলে যান।

সম্রাট আঙ্গুলে থুতু নিয়ে পৃষ্ঠা খুলতে-খুলতে হঠাৎ ঢলে পড়তে লাগলেন। কারণ প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই তীব্র বিষ মাখানো ছিল।

তখন মুণ্ড বললো—কেমন রাজা, উপকারীকে হত্যা করলেন, এবার নিজেও তার ফলভোগ করুন—এই বলে দোবানের কাটা মুণ্ড নীরব হলো, সম্রাটও কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেলেন।

জেলে এই কাহিনী শেষ করে দৈত্যকে বললো ··ওরে পাপিষ্ঠ, তুইও উপকারীর প্রাণ বধ করতে চাস্। তাই তোকে ক্ষমা না করাই উচিত। তোকে আবার আমি সমুদ্রে ফেলে দেবো।

দৈত্য তখন কাতরভাবে বললো দোহাই, আমাকে প্রাণে মেরো না। আমি তোমার এমন উপায় করে দেবো, যাতে তুমি রাজার মত অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হবে।

ধন লাভের কথা শুনে জেলের একটু লোভ হলো। সে বললো—তা'হলে দেবতার নামে শপথ করে বল্, যে আমার কোনরকম অনিষ্ট করবি না।

দৈত্য বললো—আমি দেবতার নামে শপথ করছি।

জেলে তখন কলসীর ঢাকনা খুলে নিল। দৈত্য আগের মতই ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে এসে নিজের মূর্তি ধারণ করলো। তারপরেই করলো আর এক কাণ্ড! লাথি মেরে সেই কলসীটি ভেঙে ফেললো।

তা দেখে জেলের খুব ভয় হলো। দৈত্য তা বুঝতে পেরে বললো—ভয় নেই বন্ধু, আমি উপকারীর ক্ষতি করবো না। তুমি তোমার জাল

নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।

জেলে তার জাল কাঁধে নিয়ে দৈত্যের সংগে সংগে চলতে লাগলো। নগর ছাড়িয়ে অনেক দূরে তারা ক্ষুদ্র পাহাড় ঘেরা একটি পুকুরের ধারে এসে উপস্থিত হলো! দৈত্য বললো—এই পুকুরে অনেক মাছ আছে। সাবধান, রোজ একবারের বেশী জাল ফেলবি না। যে মাছ পাবি, তা চারক্রোশ দূরে এক খলিফার কাছে বিক্রি করবে। তা'হলেই তোমার ভাগ্য খুলে যাবে—এই বলে দৈত্য চলে গেল।

জেলে দৈত্যের কথা মতো সেই পুকুরে জাল ফেললো। সেই জালে পড়লো চারটি মাছ—এক-একটি মাছ এক-একটি রঙের। দেখতেও ভারী অদ্ভুত।

জেলে সেই মাছ নিয়ে দৈত্যের কথামতো চার ক্রোশ দূরে দেশের খলিফার কাছে নিয়ে গেল। খলিফা সেই মাছ দেখে ভয়ানক খুশী হলেন। জেলেকে তার দাম বাবদ দিলেন, চারশো সোনার মুদ্রা।

জেলে এত সোনার মুদ্রা একসঙ্গে কখনও চোখে দেখেনি। সে আনন্দে নাচতে-নাচতে বাড়িতে চলে গেল।

খলিফা তাঁর মন্ত্রীকে বললেন—উজির, গ্রীস দেশ থেকে যে নূতন রাঁধুনী আনা হয়েছে, তাকে এই মাছ রাঁধতে বলো। তা'হলেই তার পরীক্ষা নেওয়া হবে আর তার বেতনও ঠিক করা হবে।

উজির তখনই অন্দরমহলে সেই খবর পাঠিয়ে দিলেন। নতুন রাঁধুনী ঘরে ঢুকে আস্ত মাছগুলি ভাজতে শুরু করলো। কিন্তু মাছগুলি সামান্য ভাজা হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটলো।

ঘরের মেঝের মাটি ফেটে গিয়ে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো এক রূপবতী নারী। হাতে তার একটি লোহার কাঠি।

সেই কাঠি দিয়ে মাছগুলিকে নেড়ে সে জিজ্ঞেস করলো—হে মৎস্য-গণ, তোমরা কি তোমাদের প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলে?

মাছগুলি মাথা তুলে জবাব দিল—না, ভুলিনি। যদি তুমি ফিরে যাও, আমরাও ফিরে যাবো। যদি তুমি আসো, আমরাও আসবো।

সেই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রূপবতী নারী মাটির ভিতরে চলে

গেল। ঘরের মেঝে আবার আগের মতো হয়ে গেল।

ব্যাপার দেখে রাঁধুনি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। যখন তার চেতনা হলো, তখন দেখলো মাছগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তখন সে ভয়ে কাঁদতে লাগলো। এমন সময় মন্ত্রী খবর নিতে এসে দেখলেন, রাঁধুনি কাঁদছে। রাঁধুনির কাণ্ড দেখে তাঁরও চক্ষুস্থির।

রাঁধুনি তখন কাঁদতে-কাঁদতে সমস্ত ঘটনা বললো। মন্ত্রী বিশ্বাস করলেন না। খলিফাকে ভয়ে কিছু জানানো হলো না। তবু সেদিনের মত রাঁধুনিকে রেহাই দিলেন।

পরের দিন জেলে আবার খলিফার কাছে চারটি মাছ নিয়ে হাজির হলো। সেই মাছ চারটিও চাররকম রঙের। আবার খলিফা তাকে চারশো সোনার মুদ্রা দিয়ে বিদায় করলেন।

সেদিনও সেই নূতন রাঁধুনীকে মাছ রান্না করতে দেওয়া হলো! মন্ত্রী আড়াল থেকে সব দেখতে লাগলেন। সেদিনও সেই ব্যাপার ঘটলো। সেই রূপবতী নারী চলে যাওয়ার পর দেখা গেল, মাছগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

মন্ত্রী তখন গিয়ে খলিফাকে এই আশ্চর্য ঘটনার কথা জানালেন।

খলিফা বললেন—আমার বিশ্বাস হয় না। কাল আমি ব্যাপারটি নিজে দেখতে চাই।

পরের দিনও জেলে এসে চারটি মাছ দিয়ে গেল। সেদিন রাঁধুনীকে রান্নার হুকুম দিয়ে রান্নাঘরের আড়ালে দাঁড়ালেন, মন্ত্রী আর খলিফা নিজে।

কিন্তু সেদিন সেই রূপবতী নারী এলো না। তার বদলে এলো একজন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ। সে এসে লোহার কাঠি দিয়ে কড়ার ওপর মাছগুলিকে নাড়তে নাড়তে আগের মতো জিজ্ঞেস করলো—হে মৎস্যগণ, তোমরা কি তোমাদের প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়েছ?

মাছগুলি বললো—না ভুলিনি। তুমি যদি আসো, তা'হলে আমরাও আসবো, আর তুমি যদি ফিরে যাও, আমরাও ফিরে যাবো।

খলিফা বললেন—এর রহস্য আমাকে জানতে হবে।

পরদিন জেলে আসতেই খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন—এই

মাছগুলি তুমি কোথায় পাও ?

জেলে বললো—হুজুর, এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে পাহাড়ে ঘেরা এক পুকুর থেকে এই মাছ ধরে নিয়ে আসি।

খলিফা বললেন—সেই পুকুরটি আমি দেখতে চাই।

জেলে বললো—আচ্ছা চলুন।

মন্ত্রী ও কয়েকজন প্রহরীসহ খলিফা জেলেকে সঙ্গে নিয়ে পুকুর দেখতে চললেন। পাহাড়ে ঘেরা সেই পুকুর দেখে খলিফা অবাক। এখানে তো আগে পুকুর ছিল না। তিনি সকলকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কেউ এখানে আগে পুকুর দেখেছো ?

সকলেই জবাব দিল—না, এখানে আমরা আগে পুকুর দেখিনি।

খলিফা সেই পুকুরের পাড়ে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিলেন। স্থির করলেন কয়েকদিন সেখানে থাকবেন।

রাত্রে সবাই যখন ঘুমে বিভোর, তখন তিনি একা বের হলেন গোপন রহস্য জানবার জন্য। কিন্তু রাত্রিবেলায় কিছু জানতে পারলেন না।

পরদিন ভোরবেলা কিছুদূরে গিয়ে একটা কালো জিনিস দেখতে পেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন একটি কালো রঙের বড়ো পাথর লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা।

খলিফা শিকল টেনে পাথরটাকে সরাতেই একটি সুড়ঙ্গ দেখতে পেলেন। সেই সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন, একটি বিরাট প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের একটি দরজা খোলা, একটি বন্ধ।

খোলা দরজা দিয়ে খলিফা প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু কোন ঘরেই কোন মানুষের সাড়া শব্দ পেকেন না। অথচ ঘরের অবস্থা দেখে মনে হলো, সেখানে মানুষ বাস করে।

খলিফা বিস্মিত হলেন, আবার তাঁর মনে ভয়ও জাগলো। তিনি চীৎকার করে বললেন—কে কোথায় আছো, এসো। আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে আশ্রয় দাও, আহার দাও।

তবু কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। ঘুরতে-ঘুরতে তিনি একটি বড় ঘরে এসে হাজির হলেন। সেই ঘরের চারকোণে চারটি সোনার

কাটা মুণ্ড কথা বলছে—২৩
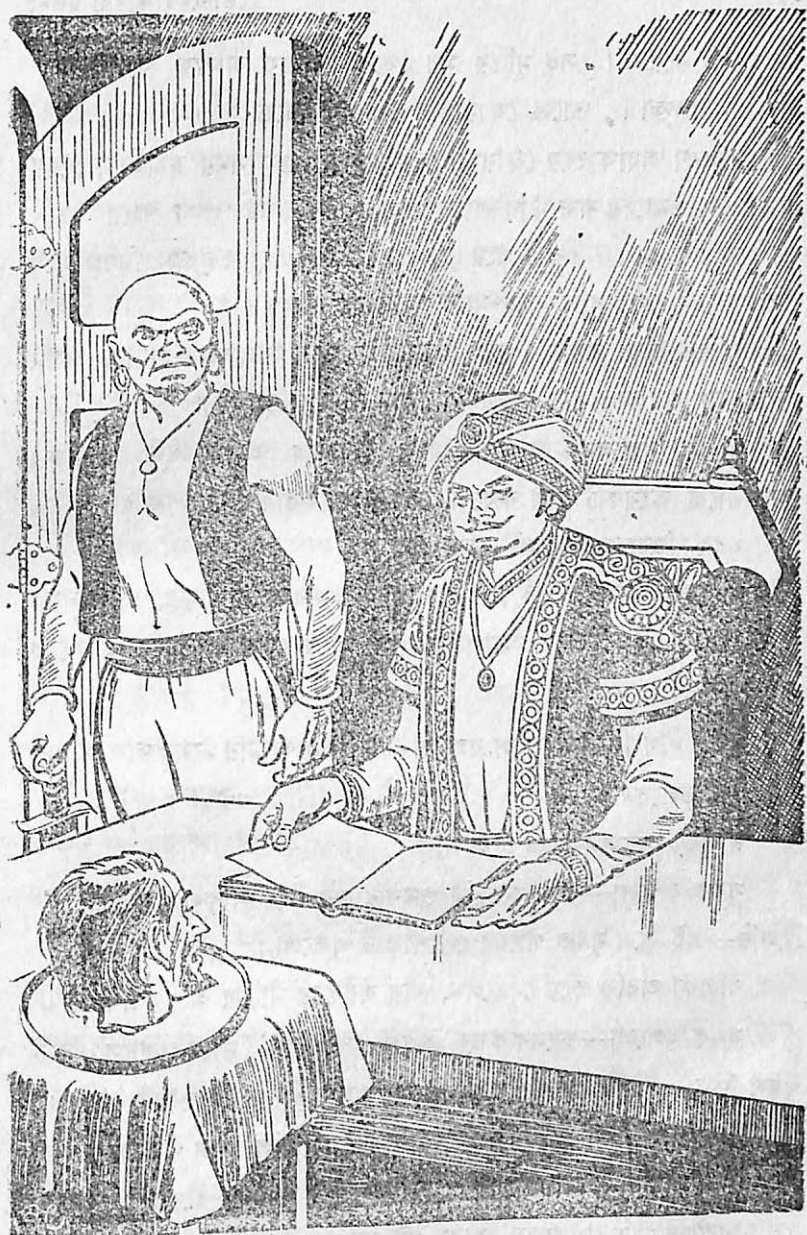
সিংহমূর্তি রয়েছে। সেই মূর্তির মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে জলের সঙ্গে নানা মণিমুক্তা। তাতে ফোয়ারার সৌন্দর্য বেড়ে উঠছে।

খলিফা অবাক হয়ে ফোয়ারা দেখছিলেন, এমন সময় হঠাৎ মানুষের কাতর আর্তনাদের শব্দ তাঁর কানে গেল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে তিনি এগিয়ে চললেন। একটি ঘরে ঢুকে দেখলেন, একজন যুবক বিষন্ন মুখে সিংহাসনের ওপর বসে মাঝে-মাঝে আর্তনাদ করছে।

খলিফা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই যুবক বললো—জনাব, আমি উঠে আপনার অভ্যর্থনা করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

খলিফা বললেন—আপনার মধুর ব্যবহারে আমি খুশী হয়েছি। আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করবো, সেগুলোর জবাব দেবেন কি ?

যুবক জিজ্ঞেস করলো—কি প্রশ্ন ?

খলিফা বললেন—এই চারটি পাহাড়ের মাঝখানে পুকুর, তাতে নানা রঙের মাছ, এই নির্জনে আপনার বাস, মাঝে-মাঝে আর্তনাদ, এ সবের রহস্য কি ?

যুবক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো—আপনি আমার মনের দুঃখ আবার জাগিয়ে তুলবেন ?

খলিফা বললেন—তা হলে থাক্।

যুবক বললো—যখন আপনি শুনবার জন্য এত আকুল হয়েছেন, তখন বলছি—এই বলে যুবক গায়ের পোশাকটি খুললো।

খলিফা অবাক হয়ে দেখলেন, তার শরীরের নীচের অংশ পাথরের।

যুবক বললো—অনেককাল আগে 'কৃষ্ণদ্বীপ' নামে এখানে একটি দেশ ছিল। সেই দেশের রাজা ছিলো মামুদ! আমি তারই ছেলে। 'কৃষ্ণদ্বীপ' ছিল কতগুলি দ্বীপের সমষ্টি, সেগুলি এখন পাহাড়। আর আমাদের রাজধানী জাদুবিদ্যার প্রভাবে পুকুরে পরিণত হয়েছে। পুকুরে যে চাররঙের মাছ দেখেছেন, তারা এই দেশের চারজাতের মানুষ।

খলিফা জিজ্ঞেস করলেন—এসব কি ভাবে হলো ?

যুবক বললো—তাহ'লে শুনুন। বাবার মৃত্যুর পর আমি রাজা হলাম। আমার রানী যে জাদুকরী ছিল, তা আমি নিজেই জানতাম

না। এক কাফ্রী দস্যুর নির্দেশেই সে চলতো। রানী তার আদেশ অমান্য করতে কখনও পারতো না।

রানীকে খুশী করবার জন্যই আমি মাটির নিচে এই রাজপুরী তৈরী করেছি। জাদুকরী রানী সেই কাফ্রী দস্যুকে নিয়ে এই পুরীরই আর একটি মহলে আছে। আমি একদিন জানতে পেরে রানীকে তরবারি দিয়ে হত্যা করতে গেলাম। রানী মন্ত্রপড়া জল আমার গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বললো—তুমি অর্ধেক মানুষ হয়ে থাকো।

সেই থেকে আমার এই অবস্থা। উঠে দাঁড়াতে পারি না। সারাক্ষণ এই সিংহাসনেই শুয়ে থাকতে হয়।

খলিফা জিজ্ঞেস করলেন—আপনার রানী এখন কোথায়?

যুবক বলল—ঐ কাফ্রী দস্যুর সঙ্গে পাশের মহলে আছে। সেই দস্যুর নির্দশে প্রতিদিন একবার করে এসে আমাকে সে বেত্রাঘাত করে। আজও কিছুক্ষণ আগে এসে আমাকে বেত্রাঘাত করছে, আবার কাল এই সময়ে আসবে।

খলিফা বললেন—তা'লে আমি এখন চলে যাই, কাল এই সময়ের একটু আগেই আবার আসবো।

সুড়ঙ্গের সিঁড়ি দিয়ে খলিফা বেরিয়ে এলেন। তারপর তাঁবুতেই রাত কাটালেন। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে হাজির হলেন পাতাল পুরীর প্রাসাদে। ঢুকতেই তাঁর কানে গেল আর্তনাদ। খলিফা বুঝতে পারলেন রানী যুবককে বেত মারছে। খলিফা সেই ঘরে না ঢুকে পাশের মহলে চলে গেলেন। দেখলেন, পালঙ্কের উপর কাফ্রী দস্যু ঘুমিয়ে আছে। দেখে চমকে উঠলেন। এই কালো লোকটিকেই তিনি সেদিন রান্না ঘরে দেখেছিলেন।

খলিফা তৎক্ষণাৎ তলোয়ার দিয়ে দস্যুর মাথা কেটে ফেললেন। তারপর তার দেহটাকে সরিয়ে ফেলে চাদরে গা ঢেকে নিজেই শুয়ে পড়লেন সে বিছানায়।

কিছুক্ষণ পরে রানী সেই ঘরে এসে ঢুকলো। ভাবলো, কাফ্রী দস্যুই বিছানায় শুয়ে আছে। রানী বলতে লাগলো—আমাকে আর

কত কষ্ট দেবে? তোমার কথায় আমার স্বামীর অর্ধেক অংশ পাথর করেছি, রাজ্যকে পাহাড় করছি আর প্রজাদের মাছে পরিণত করেছি। তবু তোমার তৃপ্তি হলো না?

খলিফা বুঝতে পারলেন, এই নারীকেই রান্না ঘরে তার মন্ত্রী ও রাঁধুনী দেখেছিলেন। তখন নিজের গলার স্বর পরিবর্তন করে বললেম—এবার তোমার স্বামীকে আবার মানুষে পরিণত কর, আগের মতো রাজ্য ও প্রজাদের ফিরিয়ে আনো।

রানী তখন বাইরে গিয় চারিদিকে মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে দিল। দেখতে-দেখতে সেই পুকুর কোথায় মিলিয়ে গেল। আবার গড়ে উঠলো কৃষ্ণদ্বীপ রাজ্য।

রানী আবার সেই ঘরে উপস্থিত হলো। খলিফা তৈরী হয়েই ছিলেন। রানী আসতেই তলোয়ার দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন।

তারপর ছুটে গেলেন যুবকের কাছে।

গিয়ে বললেন—কৃষ্ণদ্বীপের রাজা, আপনি এখন সুস্থ, উঠুন।

কৃষ্ণদ্বীপের রাজা সিংহাসন থেকে উঠে দেখলেন; সত্যি তিনি ভাল হয়ে গেছেন। খলিফাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—জনাব, কেমন করে এসব সম্ভব হলো?

খলিফা তখন সব কথা খুলে বললেন, তারপর নিজের পরিচয়ও দিলেন। আবার কৃষ্ণদ্বীপ রাজ্যে আগের মতো সুখের দিন ফিরে এলো।

এদিকে সেই বেচারী জেলে মাছ ধরতে এসে পুকুর আর খুঁজে পেল না। পুকুর কোথায়? চারদিক জুড়ে জমজমাট রাজ্য। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

কৃষ্ণদ্বীপের রাজা কিন্তু জেলের কথা খলিফার কাছে শুনেছিলেন। তার জন্যই তিনি নূতন জীবন আর রাজ্য ফিরে পেয়েছেন। তাই সেই জেলেকেই তিনি তাঁর রাজ্যের খাজাঞ্চী নিযুক্ত করলেন। দৈত্য যা বলেছিল, তা সত্যি হলো, জেলের ভাগ্য খুলে গেল।

গল্প শেষ হওয়ার পর তুনিয়ারজাদী বললো—দিদি, কি সুন্দর গল্প! আরও কয়েকটি এ'রকম গল্প তোমাকে বলতেই হবে।

শাহারজাদী বললো—দরজী ও কুঁজোর কাহিনী আরও সুন্দর। তুমি শুনতে চাইলে কি হবে? বাদশাহ্ অনুমতি না দিলে বলা যাবে না।

শারিয়ার বললেন—বেশ বলো। আমার আপত্তি নেই।

শাহারজাদী তখন আবার গল্প শুরু করলো।

* * *

অনেককাল আগে তাতার দেশে এক দরজী বাস করতো। একদিন সে তার দোকানে বসে আছে, এমন সময় এক ভিখারী এসে গান করতে লাগলো। ভিখারীর পিঠে এক বিরাট কুঁজ, দেখতেও সে খুব কদাকার। কিন্তু তার গান শুনে ও চেহারা দেখে দরজীর বেশ মজা লাগলো। দরজী ভাবলো কুঁজোকে বাড়িতে নিয়ে যাই। তার গান শুনে বাড়ির লোকও বেশ মজা পাবে।

সে তাই করলো। দোকান বন্ধ করে কুঁজোকে নিয়ে তার বাড়িতে গেল। কুঁজোর গান শুনে ও তার ভাবভঙ্গী দেখে দরজীর বউ খুব খুশী। সে তাকে রাত্রে তাদের বাড়িতে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলো।

কিন্তু সেই আনন্দ যে বিষাদে পরিণত হবে তা কে জানতো?

রাত্রিবেলা কুঁজো খেতে বসেছে। হঠাৎ তার গলায় মাছের কাঁটা আটকে গেল। কিছুতেই সেই কাঁটা খুলতে পারা গেল না। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই কুঁজো লোকটা মারা গেল।

এই আকস্মিক ঘটনায় দরজী ও তার স্ত্রী হতবুদ্ধি হয়ে গেল। এখন সেই খুনের দায় থেকে কিভাবে রেহাই পাবে? ভেবে-ভেবে কিছুক্ষণ পর একটা মতলবও তারা ঠিক করলো! কুঁজোর মৃতদেহটি দু'জনে বয়ে নিয়ে তারা হাজির হলো এক ইহুদী চিকিৎসকের বাড়ি।

রাত তখন অনেক। চিকিৎসক ঘুমিয়ে আছেন। অনেক ডাকা-ডাকি করার পর একজন দাসী এসে দরজা খুলে দিল। দরজী বললো—আমাদের এই আত্মীয়টির মর-মর অবস্থা, হাকিম সাহেবকে এসে তাকে একটু দেখতে বলো। আর এই টাকাগুলি তাঁকে দাও, তাঁর দর্শনী বাবদ অগ্রিম দিলাম।

দাসী টাকা নিয়ে উপরে চিকিৎসককে খবর দিতে চলে গেল। সেই অবসরে সুযোগ নিয়ে দরজী ও তার স্ত্রী মৃতদেহটি সিঁড়ির উপরে শুইয়ে রেখে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালালো।

এদিকে চিকিৎসক সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে মৃতদেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। মৃতদেহটিও নীচে ছিটকে পড়লো। চিকিৎসক তখন চীৎকার করে দাসীকে বললেন—শীগ্‌গীর আলো নিয়ে এসো।

দাসী ছুটে আলো নিয়ে এলো। মৃতদেহটি দেখে চিকিৎসক জিজ্ঞেস করলেন—এই লোকটা কে! এখানে এলো কি করে?

দাসী বললো—এই তো সেই রোগী, যার জন্য আপনাকে উপর থেকে ডাকতে গিয়েছিলাম।

চিকিৎসক কাছে গিয়ে রোগীর গায়ে হাত দিয়ে শিউরে উঠলেন।

দাসী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে সাহেব? রোগী বেঁচে আছে তো?

চিকিৎসক বললেন—না, মরে গেছে। এখন এই খুনের দায় আমাদের ঘাড়ে পড়বে। শীগ্‌গীর দরজা বন্ধ করো।

তখন চিকিৎসক তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরামর্শ করে স্থির করলেন, মৃতদেহটিকে পাশের বাড়িতে রেখে দেওয়া হবে।

পাশেই এক মুসলমান ভাণ্ডারীর বাড়ী। চিকিৎসক তাঁর দাসীকে নিয়ে চুপি-চুপি সেই বাড়ির দেওয়ালের পাশে মৃতদেহটি দাঁড় করিয়ে রেখে এলেন। এমন ভাবে রেখে দিলেন যে, দেখলে মনে হবে, কেউ যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাণ্ডারী সেদিন কোন এক বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে দেওয়ালের পাশে ঐ মূর্তি দেখে ভাবলো, কোন চোর দাঁড়িয়ে আছে। সে তখনই লাঠি নিয়ে খুব জোরে ঐ মূর্তির মাথায় আঘাত করলো। মৃতদেহটি দড়াম করে পায়ের কাছে পড়ে গেল। গায়ে হাত দিয়ে ভাণ্ডারী বুঝতে পারলো লোকটি মরে গেছে। সর্বনাশ! এখন কি উপায় হবে?

তাড়াতাড়ি সেই মৃতদেহটি কাঁধে নিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়লো এক নির্জন গলির মধ্যে। তারপর এক খৃষ্টানের দোকানের পাশে মৃতদেহটি দাঁড় করিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি অন্য পথে চলে গেল।

এদিকে রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। খৃষ্টানটা মাতাল হয়ে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। অস্পষ্ট আলোতে সে দেখতে পেল, একজন লোক তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মাতাল মনে করলো, লোকটি নিশ্চয়ই চোর। অমনি সে তার উপর লাফিয়ে পড়ে 'চোর' 'চোর' বলে চীৎকার করতে লাগলো, আর দমাদ্দম মারতে লাগলো কিল-ঘুষি।

সেই সময় একজন পাহারাওয়াল্লা সে-পথ দিয়ে যাচ্ছিল। চীৎকার শুনে ছুটে এসে দেখলো, একজন খৃষ্টান একটি কুঁজোকে মারছে। সে খৃষ্টানকে থামবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু তারপর দেখলো, মারের চোটে লোকটি মরে গেছে।

পাহারাওয়ালা তখনই তাকে ধরে কাজীর কাছে নিয়ে গেল। খৃষ্টানের নেশা তখন কেটে গেছে। সে বুঝতে পারলো তারই মারের ফলে কুঁজো মরে গেছে। কাজীর কাছে সে অপরাধ স্বীকার করলো। কাজী বিচার করে তার ফাঁসীর হুকুম দিলেন। কি আশ্চর্য ব্যাপার!

* * *

ফাঁসীর দিন বধ্যভূমি লোকে লোকারণ্য। ছেলে-বুড়ো-যুবক দল বেঁধে খৃষ্টানের ফাঁসী দেখতে এসেছে। কাজী তাঁর দলবল সহ আগেই সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। ঠিক সময় মতো তিনি গম্ভীর কণ্ঠে হুকুম দিলেন—'এবার গলায় দড়ি পরাও।'

যমদূতের মত একটা লোক খৃষ্টানের গলায় দড়ি পরাতে এলো। এমন সময় দেখা গেল, কে যেন চীৎকার করতে করতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পর ভাণ্ডারী সেখানে এসে দাঁড়িয়ে বললো, —কাজী সাহেব, এই খৃষ্টান লোকটির ফাঁসী দেবেন না। সে কুঁজোকে হত্যা করেনি, হত্যা করেছি আমি।

তার কথা শুনে সকলেই অবাক। কাজীর কাছে সে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। কাজী তখন ঘোষণা করলেন—খৃষ্টান লোকটির বদলে এই ভাণ্ডারীর ফাঁসী হবে।

খৃষ্টান লোকটি অব্যাহতি পেল। কাজী হুকুম দিলেন—ভাণ্ডারীকে ফাঁসী কাঠে ঝোলাও।

ভাণ্ডারী বধ্যভূমিতে গিয়ে দাঁড়ালো। তার গলায় যেই মাত্র দড়ি পরানো হবে, অমনি আবার জনতার পেছন থেকে শোনা গেল চীৎকার।

'—থামুন, থামুন।' বলে ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়ালেন সেই ইহুদী চিকিৎসক। বললেন—ঐ কুঁজো লোকটিকে আমিই মেরেছি। আপনারা শাস্তি আমাকেই দিন।

এই বলে চিকিৎসক সব ঘটনা কাজীর কাছে খুলে বললেন। তখন কাজী দেখলেন, ভাণ্ডারীর বদলে এই লোকটিরই শাস্তি হওয়া উচিত। তাই তিনি চিকিৎসকের ফাঁসীর হুকুম দিলেন।

জনতা হতভম্ব! এ যেন ভোজবাজীর খেলা চলছে। অসীম কৌতূহল নিয়ে তারা মজা দেখতে লাগল।

কিন্তু মজা তখন ও শেষ হয়নি। চিকিৎসকের গলায় দড়ি পরাতে না পরাতেই শোনা গেল আবার চীৎকার। ভিড় ঠেলে দরজী এসে বলল—কাজী সাহেব, ঐ কুঁজোর সত্যিকারের হত্যাকারী আমিই। আমাকেই আপনি শাস্তি দিন।

কাজীর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। কিন্তু দরজীর মুখে সব কথা শুনে তিনিও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তখন তিনি ঘোষণা করলেন—সমস্ত অপরাধীকেই কাসগড়ের রাজসভায় নিয়ে যাওয়া হবে। এখানে এর বিচার হবে না।

সেখানকার ঘটনা তখনই শেষ হলো। সমস্ত অপরাধীকে নিয়ে যাওয়া হলো কাসগড়ের রাজ দরবারে।

কাজী কাসগড়ের রাজার কাছে সব কিছু ঘটনা খুলে বললেন। ব্যাপার শুনে রাজাও স্তম্ভিত। তিনি প্রথমে দরজীকে তার কাহিনী বলতে আদেশ করলেন। দরজী আগাগোড়া তার কাহিনী বলে গেল।

রাজা শুনে অবাক হয়ে সকলকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কি কেউ এমন অদ্ভুত ঘটনা শুনেছ ?

খৃষ্টান জবাব দিল—জাঁহাপনা, আপনি যদি আদেশ করেন, তা হলে আমি একটি গল্প বলি।

রাজা বললেন—বেশ, যদি তোমরা গল্প বলে আমাকে খুশী করতে পার, তা' হলে শাস্তির বদলে তোমাদের পুরস্কার দেবো।

তখন খৃষ্টান বললো—আমার জন্ম মিশর দেশে। আমার বাবা বাণিজ্য করে অনেক টাকা করেছিলেন। বাবা মারা যাবার পর আমিই তাঁর সম্পত্তির মালিক হলাম। আমি একটি বড় দোকানও খুলে বসলাম।

একদিন আমি দোকানে বসে আছি, এমন সময় একজন সুন্দর যুবক গাধায় চড়ে সেখানে এসে হাজির হলো। বললো—সাহেব, আমার কাছে শস্য আছে, যদি সেগুলি বিক্রির ব্যবস্থা করে দেন, তা'হলে আমার খুব উপকার হয়। কিছুকাল আগে আমি সেগুলো কিনেছিলাম, বিক্রি করে যা লাভ হবে, তার অর্ধেক আপনাকে দেবো।

আমি তাতে রাজি হলাম। যুবক পরদিন গাড়ী বোঝাই করে শস্য নিয়ে এলো। সেগুলি তার সামনেই বিক্রি করে দিলাম। বিক্রি করে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া গেল। তখন যুবকের সাড়ে চার হাজার টাকা, আসল এবং লাভের অর্ধেক সব মিলিয়ে তাকে দিয়ে দিলাম।

যুবক কিন্তু তা নিল না। সে বললো—সাহেব, এসব টাকা এখন আপনার কাছে থাক, আমি আমার সুবিধামত নিয়ে যাবো।

যুবক চলে গেল। আমার ওপর তার এত বিশ্বাস দেখে আমি খুবই বিস্মিত হলাম। প্রায় এক মাস পরে যুবকটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে আবার আমার দোকানের সামনে এসে উপস্থিত হলো। বললো—সাহেব, আমার টাকাটা এবার দিন।

আমি বললাম—আপনার টাকা আমি দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমার বাড়িতে আপনাকে আহার করতে হবে।

যুবক বললো—আমার বিশেষ একটি কাজ আছে, তা সেরে এসেই আমি টাকা নিয়ে চলে যাবো। আপনার বাড়িতে আহার

করতে পারবো কিনা তা ঠিক বলতে পারছি না।

এই বলে যুবক চলে গেল। আমি বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসে দোকানে বসে রইলাম, কিন্তু যুবক আর এলো না।

ক্রমে-ক্রমে দু'মাস কেটে গেল। তিনমাস শেষ হবার কয়েকদিন আগে আবার সে গাধায় চড়ে এসে হাজির হলো আমার দোকানে। দেখে অবাক হলাম, তার পরনে রাজার মত পোশাক। সে বললো—আমি সাত দিনের মধ্যে ফিরছি, তখন এসে আমার টাকা নিয়ে যাবো।

এই বলে যুবকটি তাড়াতাড়ি চলে গেল। তার রহস্য আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। এক সপ্তাহ চলে গেল, তবু যুবক এলো না। তখন টাকাটা আমার ব্যবসায়ে খাটতে লাগলাম। এভাবে দেখতে দেখতে কেটে গেল এক বছর।

এমন সময় একদিন সেই যুবক এসে উপস্থিত হলো। আমি তাকে নিয়ে আমার বাড়িতে গেলাম। যুবককে আহার করতে অনুরোধ করলাম, সে আপত্তি করলো না। স্নান করে দু'জনে খেতে বসলাম। খেতে-খেতে হঠাৎ দেখলাম, যুবক বাঁ হাতে খাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—মিঞা সাহেব, আপনি বাঁ হাতে কেন খাচ্ছেন ?

যে কথা শুনে যুবকটির মুখ যেন কালো হয়ে গেল। তারপর ধীরে-ধীরে ডানহাতটি বের করলো। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ডান হাতটি তাঁর কাটা।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কিভাবে এমন হলো ?

যুবক বললো—আপনার যদি একান্তই শুনবার খুব আগ্রহ হয়ে থাকে, তা হলে বলছি, শুনুন—এই বলে কাহিনীটি বলতে লাগলো।

বাগদাদ নগরে আমি বাস করি। আমার বাবা খুব ধনী ছিলেন। ছোটকাল থেকেই আমার ছিল দেশভ্রমণের ভয়ানক নেশা। বিশেষ করে মিশর দেশের এবং তার আশ্চর্য সব জিনিসের কথা শুনে সে দেশ দেখবার আকাঙ্খা আমার প্রবল হয়ে উঠেছিল।

বাবার মৃত্যুর পর অনেক টাকা-পয়সা আমার হাতে এলো একদিন আমি মিশর দেশে যাত্রা করলাম। সেখানে আমার মনে হলো, এখানে ব্যবসা করলে অনেক লাভ হবে। তাই ব্যবসা শুরু করলাম

অল্পদিনের মধ্যে অনেক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। অনেকেই আমার দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনতো। অনেক দোকানেও আমি মালপত্র সরবরাহ করতাম।

একদিন এক কাপড়ের দোকানে কতকগুলি দামী কাপড় বিক্রী করতে গিয়েছি। এমন সময় সেখানে এক সুন্দরী মেয়ে এসে উপস্থিত হলো। মেয়েটির মুখ বোরখায় ঢাকা, সঙ্গে একজন পরিচারিকা।

মেয়েটির কোন শাড়িই পছন্দ হচ্ছিল না। তখন আরও দামী শাড়ী দোকানদারকে দেখাতে বললো। দোকানদার আমার শাড়ীগুলি তাকে দেখাতেই ওর মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে একটি দামী শাড়ী পছন্দ করে জিজ্ঞেস করলো—'এর দাম কত?'

দোকানদার দাম বললো। মেয়েটি বললো—এত টাকা এখন আমার কাছে নেই, বাড়িতে ফিরেই বাকী টাকা পাঠিয়ে দেবো।

দোকানদার বিনয়ের সঙ্গে বললো—শাহারজাদী, এই কাপড় আমার নয়, ওই যুবকের।

মেয়েটি বললো—তা হলে ওই যুবককে আমার সঙ্গে আসতে বলুন। আমি সব টাকা ওর হাতে দিয়ে দেবো।

এই সব কথা বলার সময় তার মুখের ঢাকা খুলে ফেলেছিল। তার রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

পরিচয় নিয়ে জানলাম, সে ওই অঞ্চলের আমীরের মেয়ে।

এভাবে আমীরের মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। আমি প্রতিদিন বহু মূল্যবান জিনিস তাকে উপহার দিতে লাগলাম। তার বাড়ি থেকে আসবার আগে অনেক সোনার মুদ্রা তার বিছানার তলায় রেখে আসতাম। এভাবে আমার ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টি দিনে-দিনেই কমতে লাগলো। অবশেষে একেবারে ফতুর হয়ে পড়লাম।

কিন্তু আমীরের মেয়েকে খুশী করবার নেশা মন থেকে কিছুতেই

গেল না। ধার করে তার জন্য উপহার জোগাতে লাগলাম। শেষে এমন হলো, লোকে ধার দেওয়াও আমাকে বন্ধ করলো।

অনেক চেষ্টা করেও অর্থ সংগ্রহ করতে পারলাম না। শেষে এক বণিকের দোকান থেকে এক থলি মুদ্রা চুরি করলাম। মুদ্রার থলিটি লুকিয়ে নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একজন পাহারাদার আমাকে ধরে ফেললো। বললো—ওরে, আমি সব দেখতে পেয়েছি। যদি ভাল চাস, তো থলিটি বার করে দে। নইলে তোর বিপদ হবে।

আমি বললাম—না, আমি কিছু চুরি করিনি।

গোলমাল শুনে অনেক লোক এসে জড়ো হলো। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করলো, কেউ করলো না। তখন পাহারাওয়ালা আমাকে বিচারালয়ে নিয়ে হাজির হলো। বিচারক পাহারাওয়ালার কাছে সব কিছু শুনে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি চুরি করেছ ?

আমি জবাব দিলাম—না।

বিচারক আরও অনেক প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু সব প্রশ্নের ঠিকমত জবাব দিতে পারলাম না। তখন তিনি আদেশ দিলেন—এর ডান হাত কেটে দাও, যাতে ভবিষ্যতে আর এমন কাজ করতে না পারে।

বিচারকের আদেশে তখনই জল্লাদ এসে আমার ডান হাতটি কেটে ফেললো। তারপর আমাকে বাইরে ছেড়ে দেওয়া হলো। রাস্তায় পড়ে আমি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগলাম। কয়েকজন লোক দয়া করে ওষুধ দিয়ে আমার ডান হাত বেঁধে দিল।

দু'দিন পরে আমি সুস্থ হলাম। কিন্তু রক্তপাতে আমার শরীর দুর্বল হয়ে পড়লো, চেহারা খারাপ হয়ে গেল। তবু সেই শরীর নিয়েই আমীরের মেয়ের বাড়িতে গেলাম। ডান হাতটি জামার তলায় এমন ভাবে ঢেকে রাখলাম, যাতে দেখে কিছু বুঝতে না পারে।

মেয়েটি আমাকে হয়ে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো। কিন্তু আমি সব কথা গোপন করলাম। বললাম—আমি অসুস্থ।

কিছুক্ষণ পর আমার জন্য খাবার এলো। আমি ক্ষুধায় কাতর।

তাই বাধ্য হয়ে খেতে বসলাম। বাঁ হাত দিয়ে খেতে শুরু করতেই মেয়েটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—একি, তুমি বাঁ হাতে খাচ্ছ কেন?

আমি বললাম—ডান হাতে ফোঁড়া হয়েছে।

কিন্তু এই ব্যাপার মেয়েটির কাছে গোপন রইল না। সব কথা সে জানতে পারলো। এর ফলে মেয়েটি মনে এত আঘাত পেল যে, সে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লো। কিছুদিন পরে সে মারা গেল। মরবার আগে আমাকে বললো—তুমি যা আমাকে দিয়েছ, তা সবই আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। সবই তুমি নিয়ে যাও। তা ছাড়াও তোমাকে আমি অনেক ধন রত্ন দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান, শত অভাবে পড়লেও অসৎ উপায়ে কোনদিন অর্থ উপার্জন করবে না।

সেই থেকে আমার মন কি রকম যেন ভেঙ্গে গিয়েছে।

রাজা সেই কাহিনী শুনে বললেন—এই তোমার গল্প? না, তোমাকে ক্ষমা করা যায় না। তোমার এবং তোমার সঙ্গীদেরও ফাঁসী হবে। তবে কেউ যদি এর চেয়ে ভালো গল্প বলতে পারো, তবে সকলের অপরাধ ক্ষমা করবো।

ভাণ্ডারী তখন ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বললো—জাঁহাপনা, আমি একটি গল্প বলতে ইচ্ছা করি।

রাজা বললেন—বেশ, বলো।

ভাণ্ডারী তখন তার গল্প আরম্ভ করলো—এই শহরে এক ধনী লোকের মেয়ের বিয়েতে আমার নিমন্ত্রণ হয়েছিল, তাই গত রাত্রে সেখানে গিয়েছিলাম! সেই বিয়েতে অনেক রাজ-রাজাড়াও এসেছিলেন। বিয়ে শেষ হওয়ার পর সকলে একসঙ্গে খেতে বসলাম।

ভোজের আয়োজন হয়েছিল বিরাট। তার মধ্যে রসুন দিয়ে যে জিনিসটি রান্না করা হয়েছিল, সেটি এত ভাল হয়েছিল যে সবাই রাঁধুনী প্রশংসা করছিলেন,—আর বার-বার চেয়ে খাচ্ছিলেন। কিন্তু একজন সেই জিনিসটি মোটেই খেলেন না, এমন কি থালা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

এই ব্যাপার দেখে সকলেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—মিঞা

সাহেব, আপনি ওটা এমনভাবে ফেলে দিলেন কেন?

লোকটি জবাব দিলেন—দেখুন, ওই জিনিস খেয়ে আমি এক দারুণ বিপদে পড়েছিলাম। ওই জিনিস যদি কখনও খাই, তা'হলে আমাকে চল্লিশবার ক্ষার, চল্লিশবার ছাই, চল্লিশবার সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুতে হবে।

এই অদ্ভুত কথা শুনে সকলের কৌতূহল বেড়ে গেল। আমরা বাড়ির মালিককে বললাম—জনাব, আপনি এই লোকটির চল্লিশবার হাত-মুখ ধোবার জন্য ক্ষার, ছাই ও সাবান আনিয়ে দিন।

বাড়ির মালিক আপত্তি করলেন না। ভৃত্যরা তখনই সেইসব জিনিস এনে দিল। তখন আমরা লোকটিকে বললাম—মিঞা সাহেব, এবার আপনি ঐ খাবার জিনিসটি স্বাদ গ্রহণ করুন, তারপর আপনার নিয়ম অনুসারে চল্লিশবার হাত-মুখ ধোবেন।

ভদ্রলোকটি আমাদের অনুরোধে খেতে আরম্ভ করলেন। হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম, তাঁর দু'হাতের দু'টি বুড়ো আঙ্গুল নেই।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম—মিঞা সাহেব, আপনার হাতের বুড়ো আঙ্গুল কি করে গেল?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন—আমি শুধু হাতের আঙ্গুল দু'টিই হারায়নি, পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দু'টিও হারিয়েছি। তার এক অদ্ভুত কাহিনী আছে। পরে বলবো।

ভদ্রলোক আহার শেষ করে চল্লিশবার ক্ষার, চল্লিশবার ছাই ও চল্লিশবার সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এলেন।

তারপর বলতে লাগলেন তাঁর কাহিনী—আমার বাবা এই শহরের মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করে যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন, তেমনি নষ্টও করেছিলেন অনেক। বাবার মৃত্যুর পর আমিই দোকানে বসতাম।

একদিন ভোরবেলা মাত্র দোকান খুলে বসেছি, এমন সময় বোরখা পরা এক স্ত্রীলোক দু'জন দাসী ও একজন খোজাকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলো। তারা বললো—মিঞা সাহেব, আপনার দোকানে আমাদের

কিছুক্ষণ বসতে দেবেন ? যদি দেন, তাহ'লে খুব উপকার হয়। অন্য সব বড় দোকানগুলি এখনো খোলেনি। আমাদের কিছু দামী কাপড় দরকার।

আমি বললাম—আপনাদের যতক্ষণ ইচ্ছা আমার দোকানে বসতে পারেন। যদি বলেন, আমি কিছু ভাল কাপড়ও এনে দেখাতে পারি।

তারা বললো—তা হলে তো খুব উপকার হয়।

কিছুক্ষণ পর অন্য দোকান থেকে কয়েকটি ভাল-ভাল দামী কাপড় এনে তাদের দেখলাম। স্ত্রীলোকটি মুখের আবরণ খুলে কাপড়গুলি দেখতে লাগলো। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম—এত সুন্দরও মেয়ে মানুষ হয়!

স্ত্রীলোকটি বললো—সব কাপড়গুলিই আমার পছন্দ হয়েছে। আর আপনাকে বিরক্ত করবো না—এই বলে স্ত্রীলোকটি কাপড়গুলি নিয়ে দাস-দাসীদের সঙ্গে করে চলে গেল। যতক্ষণ তারা চোখের আড়াল না হলো ততক্ষণ আমি সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর আমার চমক ভাঙলো।

সর্বনাশ ? তাদের কাছ থেকে তো কাপড়ের দামই নেওয়া হয়নি। আমি এমন আপন ভোলা হয়ে ছিলাম, যে তাদের পরিচয়ও জিজ্ঞেস করিনি। এখন মহাজন কাপড়ের দাম নিতে এলে কি করবো ? আমার এমন টাকা নেই, যে একসঙ্গে এতগুলি কাপড়ের দাম দেবো।

তখন নিজেই সেই মহাজনের দোকানে গিয়ে বললাম—সাহেব যার কাছে কাপড়গুলি বিক্রি করেছি, তিনি খুব ধনী ঘরের মেয়ে। সঙ্গে টাকা ছিল না, তাই সাত দিনের মধ্যে টাকা দিয়ে যাবেন।

দোকানদার আর কিছু বললো না। পরদিন আমি দোকান খুলে বসলাম। ভাবলাম, তারা আসবে। কিন্তু এলো না। আমার এ বোকামীর জন্য মনে-মনে ভয়ানক অনুতাপ হলো। স্ত্রীলোকটির নাম-ধাম কিছুই জেনে নিই নি, যে সন্ধান করবো।

দেখতে-দেখতে সাতদিন কেটে গেল। মহাজনটি তাগিদ দিতে লাগলো। আমি ভয়ানক লজ্জিত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, অন্য জায়গা

থেকে টাকা ধার করে এনে মহাজনের দেনা শোধ করবো।

তাই টাকার সন্ধানে বের হবার জন্য একদিন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করছি, এমন সময় সেই স্ত্রীলোকটি দাস-দাসী নিয়ে এসে উপস্থিত হলো। আমি তাড়াতাড়ি দোকান খুলে তাদের বসতে দিলাম।

স্ত্রীলোকটি একটি মুদ্রা ভরতি তোড়া আমার হাতে দিয়ে বললো—সাহেব, গুণে দেখুন, আপনার কাপড়ের দাম এতে ঠিক আছে কিনা।

আমি গুণে দেখে বললাম—ঠিক দামের চাইতে অনেক বেশী আছে।

স্ত্রীলোকটি বললো—তা থাক্। আপনি একজন অপরিচিতাকে ধারে কাপড় দিয়ে খুব উপকার করেছেন! তাই আপনার সরলতার পুরস্কারস্বরূপ অতিরিক্ত মুদ্রাগুলি আপনাকে দিলাম। কোন আপত্তি করবেন না।

আমি কিছু বলবার আগেই স্ত্রীলোকটি নূতন একটি ফর্দ আমার হাতে দিয়ে বললো—এই কাপড়গুলি আমাকে এনে দিন। খুব তাড়াতাড়ি দরকার।

আমি তখনই সেই ফর্দ নিয়ে মহাজনের কাছে গেলাম! আগেকার দাম শোধ করে নতুন ফর্দ অনুযায়ী কাপড় এনে দিলাম। স্ত্রীলোকটিও দেরী না করে তখনই চলে গেল। আজও দাম চাইতে ভুলে গেলাম। সে চলে যাওয়ার পর ভাবতে লাগলাম, এটা কোন চাতুরি নয় তো?

কয়েকদিন খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটলো। দেখতে-দেখতে কেটে গেল একমাস। তারপর একদিন স্ত্রীলোকটি এসে হাজির হলো।

এভাবে আমাদর মধ্যে পরিচয় গভীর হয়ে উঠলো। আমি স্ত্রীলোকটিকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম। স্ত্রীলোকটি বললো—আমি বেগম জোবেদীর প্রিয় সখী। আমার নাম আনিসা।

আমি আনিসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলাম। কিন্তু আনিসা বললো—বেগমের অনুমতি ছাড়া তা সম্ভব নয়।

আমার মন নিরাশায় ভেঙ্গে পড়লে। কয়েকদিন পর আমি দোকানে বসে আছি, এমন সময় ঘোড়ায় চড়ে একজন খোজা এসে উপস্থিত হলো। বললো—বেগম সাহেবা আপনাকে ডেকেছেন।

টাইগ্রীস নদীর তীরে যে মসজিদ আছে, সেখানে আজ সন্ধ্যাবেলায় আপনি অপেক্ষা করবেন। আমি সময় মতো এসে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবো।

আমি চমকে উঠে বললাম—বেগম সাহেবার কাছে যেতে হবে, সেকি! আর আমাকে লুকিয়ে যেতে হবে কেন? আমি কি কোন অন্যায় কাজ করেছি।

খোজা বললো—রাজার বাড়ির লোক ছাড়া রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ করার কারুর অধিকার নেই। তাই আপনাকে এমনভাবে গোপনে নিয়ে যাওয়া হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তাহ'লে আমাকে কি ভাবে নিয়ে যাবে?

খোজা জবাব দিল—এখনও সব ঠিক হয়নি। আপনি সন্ধ্যাবেলায় জায়গা মতো থাকবেন।

সমস্ত দিন আনন্দ অথচ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কাটলো।

সন্ধ্যা হতে না হতেই টাইগ্রীস নদীর তীরে মসজিদের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম একটি নৌকায় দু'জন খোজার সঙ্গে আনিসাও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। নৌকায় কতকগুলি বড়-বড় কাঠের বাক্স। আনিসা বললো—আপনি একটি বাক্সে ঢুকে পড়ুন।

আনিসা আমায় বাক্সবন্দী করে উপরে কিছু কাপড়-চোপড় সাজিয়ে রাখলো। আমি তার কথামতো বাক্সে ঢুকলাম। আমাকে কতকগুলি কাপড়দিয়ে ঢেকে ঢাকনা করে দিল। নৌকা চলতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর নৌকা কোথায় এসে ভিড়লো বুঝতে পারলাম না। কয়েকজন বাহক এসে বাক্সগুলি মাথায় তুলে নিয়ে যেতে লাগলো। বুঝতে পারলাম, আমি রাজবাড়ির কাছাকাছি এসেছি।

একজন প্রহরী জিজ্ঞেস করলো—এই বাক্সের মধ্যে কি আছে?

আনিসা বললো—বেগমসাহেবার মূল্যবান পোশাক এতে আছে।

প্রহরী বললো—তবু বাক্স পরীক্ষা করা হবে, তারপর ঢুকতে দেওয়া হবে। এখানকার তাই নিয়ম! বাক্সগুলি এখানে নামাও।

আনিসা সে-কথা শুনে একটু ভয় পেল। তখন কৌশল করে আমার

বাক্সটি সবার শেষে রেখে অন্য সব বাক্সগুলি খুলে দেখাতে লাগলো। একে-একে সব বাক্সই পরীক্ষা হলো। এবার এলো আমার পালা। প্রহরী যে-ই আমার বাক্সটি খুলতে যাবে, অমনি আনিসা বললে—সাবধান, এর মধ্যে কাঁচের পাত্রে মক্কার মেজমেজ ঝরণার পবিত্র জল আছে। যদি ভেঙে যায়, তাহ'লে তোমাদের শাস্তি হবে। খুব সাবধানে বুঝে শুনে খুলে দেখবে।

প্রহরী সে-কথা শুনে ঘাবড়ে গেল। আমার বাক্সটি খুলতে আর ভরসা পেল না। বললো—এগুলি ভিতরে নিয়ে যেতে পারো।

বাহকেরা বাক্সগুলি ভিতরে নিয়ে গেল। কিছুদূর যেতে না যেতেই সোরগোল শোনা গেল—বাদশা অন্তঃপুরে আসছেন।

আনিসা এবারও মুস্কিলে পড়লো। সে কি করবে চিন্তা করতে না করতেই বাদশা তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাহকদের জিজ্ঞেস করলেন—এর মধ্যে কি আছে?

আনিসা এগিয়ে গিয়ে বললো—জাঁহাপনা, এর মধ্যে বেগম সাহেবার দামী কাপড়-চোপড় রয়েছে।

বাদশা বললেন—আমি দেখতে চাই, বাক্সগুলি খোল।

বাহকরা একে-একে সব বাক্স খুলে দেখাতে বাধ্য হলো। আমি যে-বাক্সে ছিলাম, সে-বাক্সটি দেখে বাদশা বললেন—এটা একটু বড় দেখছি, এর মধ্যে কি আছে?

আনিসা বললো—জাঁহাপনা, এর মধ্যে দাসীদের সাধারণ কাপড়-চোপড় আছে। এসব আপনার দেখবার অযোগ্য।

বাদশা বললেন—যা-ই থাক্, দেখবো।

আনিসার বুক কাঁপতে লাগলো। সে ধীরে-ধীরে বাক্স খুলে আমার উপর থেকে কয়েকটি কাপড়-চোপড় দেখাতে লাগলো। বাদশা হঠাৎ বললেন—থাক, আর দেখাতে হবে না।

আনিসা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। তাড়াতাড়ি বাক্সগুলি নিয়ে অন্তঃপুরের একটি ঘরে সে ঢুকে পড়লো। বাক্স থেকে আমাকে বের করে বললে, মিঞা সাহেব, আরও কিছুক্ষণ এ ঘরে লুকিয়ে থাকুন। বাদশা এখনও

অন্তঃপুরে আছেন, তিনি চলে গেলে পর আপনি বের হবেন।

বেশ কিছুক্ষণ আমি সেই ঘরে লুকিয়ে রইলাম।

তারপর আনিসা আমাকে বেগম সাহেবার কাছে নিয়ে গেল। বেগম আমাকে অনেক রকম প্রশ্ন করলেম। তারপর বললেন—আমার সখীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার কোন বাধা নেই। কিন্তু দশদিন তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

আমি তাই করলাম। দশদিন পর আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দিন রাত্রে খেতে বসে রসুন দিয়ে রান্না একটি তরকারি আমার এত ভাল লাগলো, যে সেটা প্রচুর পরিমাণে খেলাম। ভুলে হাত-মুখ ভাল করে ধোয়া হলো না। সেই অবস্থাতেই বাসর ঘরে শুয়ে পড়লাম।

আনিসা আমার হাতে ও মুখে রসুনের তীব্র গন্ধ পেয়ে ভয়ানক রেগে উঠলো। চীৎকার করে দাসীদের ডেকে বললে—এই অসভ্য লোকটা রসুন খেয়ে হাত-মুখ ভাল করে ধোয় নি, ওকে বের করে দাও। জল্লাদদের ডাকো, ওর হাত কেটে ফেলুক।

আমি মিনতি করে বললাম—আনিসা, এখানকার নিয়মকানুন কিছুই জানি না। আমাকে ক্ষমা করো।

কিন্তু মিনতিতে কোন ফল হলো না। সখীরা আমাকে বের করে এনে অন্য একটি ঘরে বন্দী করলো। পরদিন ভোরবেলা জানতে পারলাম, আনিসা আমাকে শাস্তি দেবার ভার নিজের হাতে নিয়েছে। দশদিন আমি সেই ঘরে বন্দী রইলাম। তারপর একদিন আনিসা তার সখীদের নিয়ে আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলো। তারা আমার হাত-পা বেঁধে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হাতের দু'টি বুড়ো আর পায়ের দু'টি বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেললো। আমি যন্ত্রণায় চেতনা হারিয়ে ফেললাম।

জ্ঞান হয়ে দেখলাম, আমার হাতে ও পায়ে ওষুধ দেওয়া হয়েছে। আনিসার কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম—আর কখনও রসুন খাবো না। যদি ভুলে কখনও খাই, তা'হলে চল্লিশবার ক্ষার দিয়ে, চল্লিশবার ছাই দিয়ে আর চল্লিশবার সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধোব।

আনিসার আক্রোশ এবার কমে গেল। দু'জন একত্রে বাস করতে

লাগলাম। কিন্তু ভাগ্য আমার খারাপ, একবছর যেতে না যেতেই আনিসা মারা গেল। তারপর থেকে আমি বিবাগী, ঘরছাড়া। এখন আমি এই নগরে বাস করছি। আমার আঙ্গুল কাটার আর চল্লিশবার করে হাত-মুখ ধোয়ার এই হলো ইতিহাস।

ভাণ্ডারী গল্প শেষ করে বললো—জাঁহাপনা, এই গল্পটি কাল আমি বিয়ের নিমন্ত্রণ সভায় শুনেছি। এটি আপনার কেমন লাগলো ?

রাজা বললেন—তোমার গল্পটিও তেমন আশ্চর্যজনক নয়। কাজেই তোমার সকলের প্রাণদণ্ড হবে।

এমন সময় ইহুদী চিকিৎসক হাতজোড় করে বললেন—জাঁহাপনা, আমি একটি আশ্চর্যজনক গল্প জানি। যদি অনুমতি করেন তবে বলি।

রাজা বললেন—তোমার গল্প যদি আশ্চর্যজনক না হয়, তা'হলে তোমাদের সকলের গর্দান যাবে। বেশ, এখন আরম্ভ করো।

ইহুদী চিকিৎসক তখন গল্প বলতে লাগলো—জাঁহাপনা, দামাস্কাস নগরে আমার বাস। সেখানেই আমি চিকিৎসা করে থাকি। একদিন সেখানকার রাজার বাড়ি থেকে আমার ডাক এলো। আমি গিয়ে দেখলাম একটি সুন্দর যুবক বিছানায় শুয়ে আছে। আর নাড়ী দেখবার জন্য তাকে হাত বের করতে বললাম। কিন্তু বাঁ হাত দেখাতে হয়, যুবকটি হয়তো তা জানে না। যা হোক, আমি বাঁ হাত দেখেই ওষুধের ব্যবস্থা করলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই যুবক সুস্থ হয়ে উঠলো।

কিছুদিন পর যুবকের অনুরোধে সেই বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গেলাম। সেদিন দেখতে পেলাম, তার ডান হাত নেই। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার ডান হাত নেই কেন ?

যুবক তখন তার কাহিনী বলতে লাগলো—জনাব, আমি মোজল নগরের এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার বাবা আমাকে ভালভাবেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন।

মিশর দেশের নানা সুখ্যাতির কথা শুনে সেই দেশ দেখবার আগ্রহ আমার প্রবল হয়ে উঠলো। বাবাকে সেকথা বলতেও তিনি কোন আগ্রহ দেখালেন না। তখন কাকার শরণাপন্ন হলাম। কাকা আমাকে

নিয়ে যাত্রা করলেন। দামাস্কাস নগর আমার এত ভাল লাগলো, যে সেখানে কিছুদিন থাকবার ইচ্ছা হলো। কাকা আমাকে রেখে চলে এলেন আমি একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে বাস করতে লাগলাম।

সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। মেয়েটি দেখতে খুবই সুন্দরী ছিল। তার রূপের প্রশংসা করতেই সে একদিন বললো, —আমি আর কি, সুন্দরী, আমার চেয়েও সুন্দরী একজন আছে। যদি বলেন তাহ'লে আপনাকে এনে দেখতে পারি।

আমি রাজি হলাম। পরদিন সে আর একটি মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হলো। সেই মেয়েটি সত্য সত্যই তার চেয়েও সুন্দরী।

তখন ঠিক করলাম, পরের মেয়েটিকে বিয়ে করবো। তাই তার সঙ্গে মাঝে-মাঝেই গল্প-গুজব করতাম, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতাম। প্রথম মেয়েটিও এসে আমাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করতো। কিন্তু তার মন ভরা ছিল হিংসা।

একদিন খাওয়া-দাওয়ার পর জল খেয়েই দ্বিতীয় মেয়েটি ঢলে পড়লো। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, সে মারা গিয়েছে। বুঝলাম, এটা প্রথম মেয়েটির কারসাজি। খাবার জলে সে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।

আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্য বাগানে মাটি খুঁড়ে মেয়েটিকে কবর দিলাম। তার গলায় বহুমূল্য হার ছিল। সেটাকে কাছে রাখা নিরাপদ মনে করলাম না। এদিকে বে-হিসেবীর মত খরচ করতে-করতে আমার অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে উঠলো। তাই হারটা বিক্রি করবার জন্য এক স্বর্ণকারের দোকানের দিকে রওনা হলাম।

কিন্তু পথে এক নগররক্ষক আমাকে ধরে কাজীর কাছে নিয়ে গেল। হারটা আমি কোথায় পেলাম তার ঠিকমত জবাব দিতে পারলাম না। তখন কাজী আমার ডান হাত কেটে ফেলবার হুকুম দিলেন। সেই থেকে আমি ডান হাত হারা হলাম।

কিছুদিন পরে একদিন প্রহরী এসে আমাকে বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে গেল। আমার ওপর নারী হত্যার অভিযোগ চাপানো হলো। রাজা আমাকে দেখে বললেন—এর দ্বারা এসব কাণ্ড হতে পারে না।

আমি সে অভিযোগ থেকে মুক্ত হলাম। কিন্তু মনে শান্তি পেলাম না, তখন সব রাজার কাছে খুলে বললাম। রাজা তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—এসব আমারই কর্মফল। ওই দু'টি আমারই মেয়ে। বড় মেয়েটির ছিল মাথা খারাপ। তোমার ঘরের সে তার মেজো বোনকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। বড় মেয়েও আর বেঁচে নেই। তোমার এই দুর্দশার জন্য আমার মেয়েরাই দায়ী। যা হোক, আমার কোন সন্তান নেই। তুমি আমার অর্ধেক রাজত্ব ভোগ করো।

আমি শাস্তির পরিবর্তে, আশাতীত পুরস্কার লাভ করলাম। সেই থেকে আমি এই রাজবাড়িতেই আছি। আমিই এখন এ রাজ্যের ভাবী রাজা, আর এই হলো আমার ডান হাত কাটার ইতিহাস।

ইহুদী চিকিৎসক গল্প শেষ করে বললেন—জাঁহাপনা, এই গল্প কি আশ্চর্যজনক নয়?

রাজা বললেন—না, এই গল্প শুনেও আমি সন্তুষ্ট হলাম না। কাজেই তোমাদের সকলেরই ফাঁসী হবে।

তখন দরজী বললো—জাঁহাপনা, আমাকে অনুমতি করুন, আমি একটি গল্প বলি। যদি শুনে আপনি খুশী হন, তা'হলে আমাদের ফাঁসীর হুকুম রদ করবেন।

রাজা বললেন—বেশ, বলো।

দরজী তখন গল্প বলতে লাগলো। জাঁহাপনা, একসময় এই নগরের একজন নামজাদা লোক কোন উৎসব উপলক্ষে বহু লোককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই ভোজ সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম আমাদের খাওয়া-দাওয়া শুরু কখন হবে ঠিক নেই, একটি খোঁড়া যুবক সেখানে উপস্থিত হলো। কিন্তু সভার চারিদিকে একবার তাকিয়ে তখনই সে চলে যাবার উদ্যোগ করলো। তাকে যেতে দেখে বাড়ির মালিক জিজ্ঞেস করলেন—সাহেব, আপনি চলে যাচ্ছেন কেন?

যুবক বললো—জনাব, এই সভায় একজন নাপিত উপস্থিত রয়েছে। তার জন্যই আজ আমি খোঁড়া। তাই তার মুখ দর্শন করতে আমি ইচ্ছুক নই। এই নাপিত বাগদাদে থাকে বলে আমি নিজের বাসস্থান

বাগদাদও ছেড়ে এসেছি। কাজেই এখানে থাকতে আর অনুরোধ করবেন না।

যুবকের এই কথা শুনে আমাদের কৌতূহল ভয়ানক বেড়ে গেল! বললাম—আপনার খোঁড়া হওয়ার কাহিনী দয়া করে বলবেন কি?

এত সব লোকের অনুরোধ যুবক এড়াতে পারলো না। সে তার গল্প বলতে লাগলো—আমার বাবা বাগদাদ শহরের একজন বড় বণিক ছিলেন। তাঁর অর্থও প্রচুর ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আমি সমস্ত সম্পত্তির মালিক হলাম। আগে থেকেই আমার ভাল পোষাক পরা ও বাবুগিরি করার দিকে ঝোঁক ছিল। কিন্তু মেয়েদের আমি বড় ঘৃণা করতাম।

একদিন বিকেলে পথে বেরিয়েছি, এমন সময় একদল মেয়ে সেই পথে এসে হাজির হলো। আমি বিরক্ত হয়ে সেই পথ ছেড়ে অন্য একটি পথ ধরে একটি বাড়ির সামনে গিয়ে বসলাম। তার বিপরীত দিকে বড় বাড়ির দিকে হঠাৎ নজর পড়লো। দেখলাম, একটি সুন্দরী মেয়ে জানালার সামনে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার পরেই সে জানালা বন্ধ করে দিল। সেদিন থেকে মেয়েদের প্রতি আমার যে ঘৃণা ছিল, তা দূর হয়ে গেল। পরে খবর নিয়ে জানলাম, ঐ মেয়েটি সেই শহরের কাজীর মেয়ে। তখন আমার মন থেকে সব আশা-ভরসা দূর হয়ে গেল। এরপর আমার কঠিন অসুখ হলো। কিছুতেই রোগ সারে না। তখন একজন প্রতিবেশী বৃদ্ধা এসে বললো —তোমার কি হয়েছে সব খুলে বলো, আমি চিকিৎসা করবো।

বৃদ্ধার কাছে আমি সব খুলে বললাম। সব কথা শুনে বৃদ্ধা বললো—আমি কাজীর মেয়ের সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দেবো। তারপর কাজীর আপত্তি না থাকলেও তোমাদের বিয়ের কথা হবে!

তাতে আমি খুব খুশী হলাম। কিছুদিন পর বৃদ্ধা এসে বললো—আজ তোমাকে কাজীর বাড়িতে নিয়ে যাবো।

সেকথা শুনে আমি তখনই দাড়ী কামাবার জন্য একজন নাপিত খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। পথে এই নাপিতের সঙ্গে দেখা হলো। নাপিত

একটি আয়না বের করে রৌদ্রে ধরে বললো—মিঞা সাহেব, আজ আপনি কামাবেন না, তা'হলে আপনার বিপদ হবে।

আমি তাতে বিরক্ত হয়ে বললাম—তোমার এত কথায় কাজ কি? তুমি আমাকে কামিয়ে দাও।

নাপিত বললো—আমি চুল কাটি বলে আমাকে মূর্খ মনে করবেন না! আমি দর্শন, জ্যোতিষ, চিকিৎসা এবং আরও অনেক বিষয় ভাল ভাবে জানি। আপনার অনিষ্টের আশঙ্কা আছে মনে করেই আপনাকে কামাতে নিষেধ করছি।

আমি তাতে আরও বিরক্ত হয়ে বললাম—তুমি কেন সময় নষ্ট করছো? আমার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে, কাজেই আমাকে কামাতে হবে।

নাপিত বললো—মিঞা সাহেব, তা'হলে আপনি আজ যেখানে যাবেন, দয়া করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

আমি বললাম—না, তোমাকে সে জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো না।

নাপিত আর কিছু না বলে আমাকে কামিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমিও ভাল পোষাক পরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম।

কাজীর বাড়িতে সদর দরজা দিয়ে ঢুকবো, এমন সময় দেখলাম, সেই নাপিত বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর উদ্দেশ্য কিছু বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে পড়লাম। কাজীর মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো। এমন সময় হঠাৎ বাইরে কোলাহল শুনে আমি চমকে উঠলাম। কাজীর মেয়ে বললো—আপনি ভয় পাবেন না, এই বড় কাঠের বাক্সটার মধ্যে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ুন। আমার বাবা আসছেন।

আমি তাই করলাম। কাজী সাহেব ঘরে ঢুকে কোন কারণে চাকরদের ভীষণ ভাবে মারতে লাগলেন। নাপিত তখন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ভাবলো, কাজী বোধহয় আমাকে প্রহার করছেন। তাই তাড়াতাড়ি আমার বাড়িতে গিয়ে কয়েকজন লোক ও আমার চাকরদের নিয়ে এসে কাজীর বাড়ি ঘেরাও করলো। কাজী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা এখানে হামলা করছো কেন?

আমার লোকেরা বললো—আমাদের প্রভুকে আপনি প্রহার করছিলেন কেন?

কাজী জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের প্রভু এখানে কোথায়?

নাপিত বললো—আপনার বাড়িতেই আছেন, আমরা তাঁকে খুঁজে নিয়ে আসবো?

কাজী বললেন—বেশ নিয়ে এসো।

নাপিত আমাকে খুঁজে বের করতেই সকলে বাক্সসহ আমাকে মাথায় করে বাড়ির বাহিরে নিয়ে এলো। আমি চীৎকার করে বাক্স নামাতে বললাম, কিন্তু কেউ শুনলো না। তখন আমি লাফ দিয়ে নীচে পড়লাম। সেই সময়ে আমার পা ভেঙে গেল!

পা ভাঙা অবস্থায় ছুটতে-ছুটতে একটি সরাইখানায় এসে উপস্থিত হলাম। সেখানেও পেছনে তাকিয়ে দেখি সেই নাপিত। তখন আমি সরাইয়ের মালিককে বললাম—সাহেব, আপনি দয়া করে ঐ নাপিতকে সরাইখানায় ঢুকতে দেবেন না। আমি যে পর্যন্ত না আরোগ্য লাভ করি, ততদিনের জন্য একটা ভাল ঘরের ব্যবস্থা করে দিন। আমি আপনাকে প্রচুর টাকা দেব।

সরাইখানার মালিক আমার কথামতো কাজ করলেন। এদিকে নাপিত লোকের কাছে বলে বেড়াতে লাগলো, সে-ই আমাকে মরণের হাত থেকে রক্ষা করেছে আর নিরাপদে সরাইখানায় পৌঁছে দিয়েছে।

কি সাংঘাতিক লোক। কিছুদিন পর আমি সুস্থ হয়ে নাপিতের ভয়ে গোপনে বাগদাদ শহর ছেড়ে চলে এলাম। কিন্তু দেখছি এখানেও সে আমার খোঁজে এসেছে।

এই বলে খোঁড়া যুবক তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে চলে যায়। আমরা সকলেই বিস্মিতভাবে নাপিতের দিকে তাকাতে লাগলাম। সে তা বুঝতে পেরে আমাদের কাছে এগিয়ে এসে বললো—আপনারা সকলে শুনুন। আমার ইচ্ছা ছিল, ওই যুবকের কিছু উপকার করি। কিন্তু যুবকটি আমাকে সেই সুযোগ দেয়নি, বরং আমাকে বাচাল বলে নিন্দা করেছে। এই মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করার জন্য আমার ও আমার

ভাইয়ের কাহিনী আপনাদের কাছে বলছি। শুনুন। বাগদাদে বিল্লা নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। সেই সময়ে দশজন ডাকাতের অত্যাচারে সমস্ত বাগদাদ শহর কাঁপতো। রাজা আমাকে আদেশ করলেন, ডাকাতদের ধরে আনতে হবে, নচেৎ তোমার গর্দান যাবে।

রাজার অমন কঠোর আদেশ শুনে সেনাপতি বহু গুপ্তচর চারিদিকে পাঠালেন। কিছুদিন পর ডাকাত দশজন ধরা পড়লো। কোন এক পর্ব দিনে সেনাপতি সেই ডাকাতদের নিয়ে টাইগ্রীস নদী পার হবার জন্য নৌকায় উঠছিলেন। আমিও সেই সময় নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। নৌকায় দশজন ভদ্র পোষাক পরা লোককে দেখে মনে করলাম, তারা পর্বের দিনে জলভ্রমণ করতে বেরিয়েছে। আমিও তখন সেই নৌকায় গিয়ে উঠলাম।

কিছুক্ষণ পরে নৌকা রাজপ্রাসাদের ঘাটে এসে ভিড়লো। তখন কয়েকজন রাজকর্মচারী এসে ডাকাতদের সঙ্গে আমাকেও বেঁধে ফেললো। পরে আমি সমস্ত ঘটনা বুঝতে পারলাম। কিন্তু কোন আপত্তি করতে পারলাম না। কারণ আমি ডাকাতদের সঙ্গে এসেছি; যদি ·লি আমি ডাকাত নই, কেউ তা বিশ্বাস করবে না।

ডাকাতদের সঙ্গে আমাকেও রাজদরবারে নিয়ে হাজির করা হলো। রাজা দশজন ডাকাতের মুণ্ড কেটে ফেলবার হুকুম দিলেন। ঘাতক একে একে পরপর দশজনেরই মাথা কেটে ফেললো। তারপর যখন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, তখন রাজা রাগে হুঙ্কার দিয়ে বললেন—দাঁড়িয়ে আছো কেন? নয়জনের মাথা কাটা হয়েছে, এই লোকটিকে কাটলে তবে দশজন হবে।

ঘাতক বললো—হুজুর, দশজনকেই আমি কেটেছি। এই বলে একে-একে দশটি মুণ্ড গুণে রাজাকে দেখালো।

রাজা তখন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি তা'হলে কে? কেনই বা তোমাকে এখানে বেঁধে এনেছে?

আমি রাজাকে সব ঘটনা খুলে বললাম। রাজা তখন অবাক হয়ে বললেন—তুমি তো অদ্ভুত মৌনী লোক। তোমার জীবন

বিপন্ন, তবু তুমি একটিও কথা বলোনি কেন?

আমি বললাম—জাঁহাপনা, আমি চিরকালই কম কথা বলে থাকি। কিন্তু আমার ছয়টি ভাই আছে, তারা আমার চেয়ে অনেক বেশী কথা বলে।

রাজা বললেন—তাদের কি রকম স্বভাব, তা আমার শুনতে খুব ইচ্ছা করছে।

আমি বললাম—জাঁহাপনা, আমার প্রথম ভাই নিরক্ষর, দ্বিতীয় ভাই দন্তহীন, তৃতীয় ভাই জন্মান্ধ, চতুর্থ ভাই একচক্ষু, পঞ্চম ভাই কানকাটা এবং ষষ্ঠ ভাইয়ের ঠোঁট শশকের মত।

এখন প্রত্যেকের অদ্ভুত কাহিনী শুনুন—জাঁহাপনা, আমার প্রথম ভাইয়ের নাম বাকবারা। বাগদাদ নগরে তার একটি দরজীর দোকান ছিল। তার দোকানের সামনে ছিল এক ধনী ময়দার কলওয়ালার বাড়ি। সেই বাড়িতে বণিক তাঁর পরমাসুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে দোতলায় বাস করতেন। নীচের তলায় তাঁর ময়দার কল চলতো। বাকবারা দোতলার জানালা দিয়ে বণিকের স্ত্রীর দিকে মাঝে-মাঝেই তাকিয়ে থাকতো। বণিকের স্ত্রীও ছিল চালাক, তাই সে ভাবলো, লোকটার সংগে একটু রঙ্গ করা যাক্।

একদিন সেই বণিকের বাড়ির দাসী বাকবারার দোকানে এসে হাজির হলো। তার হাতে কয়েকটা পোশাক। সে বললো—মিঞা সাহেব, আপনি নাকি ভালো পোশাক তৈরী করতে পারেন? আমাদের বাড়ির বিবি সে-কথা শুনেছেন। তাই এই পোশাকগুলির মাপে আরও কয়েকটা পোশাক তৈরী করে দেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছেন।

বাকবারা খুশী হয়ে বললো—আমি সারারাত জেগে পোশাকগুলি তৈরী করে দেবো। তুমি কাল সকালেই এসো।

পরদিন ভোরবেলাতেই দাসী এসে হাজির। বাকবারা পোশাকগুলি দাসীর হাতে দিয়ে বললে এই নাও। বাজারের সেরা কাপড় দিয়ে এগুলি তৈরী করেছি। দাসী কৌতুক করে বললো—আমাদের বিবিও

পোশাকগুলির জন্য সারারাত জেগেছেন আর আপনার কথা বলেছেন।

বাকবারা আনন্দে দাসীর কাছে দাম চাইতে ভুলে গেল। এরকম ঘটনা ঘটলো আরও কয়েকদিন। এভাবে পোশাক তৈরী করার জন্য বাজারে তার অনেক টাকা দেনা হয়ে পড়লো।

একদিন বণিক বাকবারাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে কতকগুলি জামা তৈরী করার আদেশ দিলেন। জামা তৈরী হয়ে গেলে বণিক দাসীকে বললেন—এর মজুরী দিয়ে দাও।

দাসী বললো—দামের জন্য ওর কাজ আটকাবে না। বরং মুদ্রাগুলি আমাদের কাছে জমা থাক, পরে একসঙ্গে দেওয়া যাবে।

বাকবার কোন কথা না বলে খালি হাতে চলে গেল। বণিক বুঝতে পারলেন, লোকটি বোকা।

একদিন বণিক বাকবারাকে তাঁর বাড়িতে রাত্রিবেলায় খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। খাওয়া-দাওয়া করতে-করতে রাত অনেক হয়ে গেল। তখন দাসী ঠাট্টা করে বললো—বেশী রাত হয়েছে, যাবার দরকার নেই। আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে থাকুন।

বাকবার ভাবলো, আজ বণিকের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ হবে। তাই সে ময়দার কলঘরে লুকিয়ে রইলো।

এদিকে রাত্রে বণিক কলঘরে বাকবারকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। মনের ভাব গোপন করে বললেন—এই যে বন্ধু, তুমি এখানেই আছো দেখছি। যাক ভালই হলো। আমার বলদের অসুখ করেছে, কিন্তু কাল অনেক ময়দার দরকার। যদি তুমি দয়া করে কলটা কিছুক্ষণ ঘোরাও, তা হলে কিছু গম ভাঙিয়ে নিই।

বাকবারা কোন উপায় না দেখে রাজী হলো। বণিকের বলদের জায়গায় তাকে বেঁধে চাবুক মেরে ঘোরাতে লাগলো, বাকবারা যন্ত্রণায় চীৎকার করতে-করতে কল চালাতে লাগলো। রাত শেষ হওয়ার পর বণিক তাকে মুক্তি দিলেন। আমার মূর্খ ভাই এবার চরম সাজা পেল। এরপর আর সে কোনদিন বণিকের বাড়ির জানলার দিকে তাকায়নি। এই হলো আমার প্রথম ভাইয়ের ইতিহাস।

রাজা গল্প শুনে হেসে বললেন—বেশ গল্প, এবার অন্য ভাইদের গল্প বলো দেখি।

নাপিত তখন তার দ্বিতীয় ভাইয়ের গল্প শুরু করলো—জাঁহাপনা, আমার দ্বিতীয় ভাই দন্তহীন, তার নাম বাকবাক। সে একদিন এক দুষ্টা নারীর পাল্লায় পড়লো। সেই নারীর অনেকগুলি সখী ছিল। সখীরা একদিন বাকবাককে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে শাড়ী পরিয়ে মেয়েমানুষ সাজিয়ে দিল। তারপর বললো—আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলো।

লুকোচুরি খেলতে-খেলতে বাকবাক দেখলো, সে বাড়ির বাইরে বাগানের মধ্যে এসে পড়েছে, ভিতরে যাওয়ার পথও বন্ধ। তখন সেই মেয়েমানুষের বেশেই নিজের বাড়িতে ফিরে এলো। ইস্ কি লজ্জা! আর কোনদিন সেই দুষ্ট নারীর নাম সে মুখে আনেনি।

এবার তৃতীয় ভাই অলকুজের গল্প বলি। অলকুজ ছিল জন্মান্ধ, ভিক্ষা করে তার দিন চলতো। তার একটি অভ্যাস ছিল। ভিক্ষার জন্য যে বাড়ির দরজায় আঘাত করতো, সেই বাড়ি থেকে যতক্ষণ না কোন লোক বের হতো, ততক্ষণ সে আঘাত করতে থাকতো। একদিন অলকুজ এক বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে প্রশ্ন হলো—কে?

অলকুজ জবাব না দিয়ে কড়া নাড়তেই লাগলো। তখন বিরক্ত হয়ে বাড়ির মালিক বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলো—এমনভাবে কড়া নাড়ছো কেন?

অলকুজ বললো—আমি ভিক্ষা চাই।

বাড়ির মালিক ছিল এক ডাকাতের সর্দার। আমার ভাইকে জব্দ করার জন্য তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে উপরের ঘরে বসালো! ভাই কিছু বুঝতে না পেরে বললো—আমি অন্ধ, আমাকে ভিক্ষা দিন।

ডাকাতের সর্দার বললো—তুমি দূর হও।

অলকুজ বললো—আমি চোখে দেখতে পাইনা, আমাকে নামিয়ে দিন। সর্দার বললো—যখন কড়া নাড়ছিলে তখন 'তুমি কে' সেকথা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন জবাব দাওনি। তখন জবাব দিলে এই কষ্ট ভোগ করতে হতো না।

অলকুজ তখন অতিকষ্টে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পথে আরও

দু'জন অন্ধ তার সঙ্গে মিলিত হলো। ডাকাতের সর্দার উপর থেকে তা দেখতে পেয়ে কি ভেবে তাদের পিছু-পিছু চলতে লাগলো। অন্ধরা কিন্তু কিছুই টের পেল না। তারা একটি পুরনো ভাঙা ঘরে এসে ভিক্ষায় পাওয়া জিনিসগুলি একটি গোপনীয় জায়গায় রেখে দিল।

অবশেষে ঘরের কোণের আবর্জনার ভিতর থেকে মুদ্রার থলি বের করে অলকুজ বললো—এটা আমাদের সারা জীবনের সঞ্চয় করা অর্থ। এর থেকে কিছু নিয়ে তোমরা ভাল খাবার কিনে নিয়ে এসো।

অপর অন্ধ দু'জন বললো—আজ আরো ভাল ভিক্ষাই পেয়েছি, এতেই চলবে। কাজেই জমানো অর্থ খরচ করার দরকার নেই।

ডাকাতের সর্দার চুপি-চুপি ঘরে ঢুকে সব কিছু দেখলো। তারপর যে-ই থলিটা নেবার জন্য হাত বাড়ালো, অমনি আমার ভাই তার হাত চেপে ধরে 'চোর' 'চোর' বলে চীৎকার করে উঠলো।

অন্য দু'জন ভাইও সাহায্য করলো। কিছুক্ষণ পর কাছাকাছি বাড়ি থেকে বহুলোক ছুটে এসে ডাকাতকে ধরে ফেললো। ডাকাত দেখলো, মহা বিপদ। সে চালাকী করে তৎক্ষণাৎ চোখ বুঁজে অন্ধ সেজে গেল। তারপর লোকেদের বললো—এই থলিতে যে মুদ্রা আছে তার চার ভাগের এক ভাগ আমার। কারণ আমিও এদের সঙ্গে ভিক্ষা করেছি! কিন্তু আমাকে ঠকাবার জন্য 'চোর' বলে ধরিয়ে দিচ্ছে।

তখন সব লোকেরা চারজনকেই ধরে রাজদরবারে পাঠিয়ে দিল।

রাজা অন্ধ তিনজনের সাক্ষ্য শুনে ডাকাতদের চাবুক মারবার হুকুম দিলেন। চাবুক মারা হতে লাগলো। যখন আর সহ্য করতে পারলো না তখন ডাকাত চোখ খুলে বললো—মহারাজ, আমরা কেউই অন্ধ নই। এখন আপনি সুবিচার করে আমাকে প্রাপ্য অংশ দিতে অনুমতি করুন। আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তা'হলে এদেরও চাবুক মারুন, তা'হলেই এরা সব স্বীকার করবে।

রাজা তখন অন্ধ তিনজনকেও চাবুক মারার আদেশ দিলেন। মার খেয়ে অন্ধরা চীৎকার করতে লাগলো, কিন্তু চোখ খুললো না। কারণ, তারা যে প্রকৃতির অন্ধ! রাজা মনে করলেন, পাছে টাকার অংশ দিতে হয়, সেজন্যই তারা চোখ খুলছে না; তাই আরো জোরে চাবুক মারতে আদেশ দিলেন।

অন্ধ তিনজন শেষে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। রাজা তাদের নগর থেকে বেরিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। বিচারে স্থির হলো, এক ভাগ অর্থ ডাকাত পাবে, আর তিনভাগ রাজকোষে জমা হবে।

সেই থেকে আমার ভাই অলকুজ দেশ ছাড়া।

এইবার আমার চতুর্থ ভাইয়ের কাহিনী শুনুন।

সেই ভাইয়ের নাম আলফোজ। মাংস বিক্রি করে সে জীবিকা নির্বাহ করতো। একদিন এক বৃদ্ধ এসে অনেক মাংস কিনে কতকগুলি নতুন চকচকে মুদ্রা দিল। আমার ভাই সেই মুদ্রগুলি যত্ন করে রেখে দিল।

বৃদ্ধ রোজই এসে মাংস কিনতো আর চকচকে মুদ্রা দিত। এভাবে আমার ভাইয়ের কাছে অনেক চকচকে মুদ্রা জমলো।

একদিন আমার ভাই মুদ্রাগুলি হিসাব করতে গিয়ে দেখে সেগুলি সবই মাটির ঢেলা। একি ব্যাপার। নিশ্চয়ই লোকটা ভোজবাজী জানে।

পরদিন বৃদ্ধ আসতেই তাকে ধরে 'চোর' 'চোর' বলে চীৎকার করতে লাগলো। সঙ্গে-সঙ্গে অনেক লোকের ভিড় জমে গেল।

সবাই জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে?

আলফোজ তখন সব ঘটনা খুলে বললো।

কিন্তু বৃদ্ধ বললো—'সাহেবরা শুনুন, এই লোকটি যা বলছে, সব মিথ্যা। এমন কি মেষ মাংস বলে রোজ সে নরমাংস বিক্রি করে।

লোকেরা বললো—তা কখনও হতে পারে না।

বৃদ্ধ বললো—আপনারা যদি আমায় বিশ্বাস না করেন, তা' হলে দোকানে কাপড়ে ঢাকা যে মাংস ঝুলানো আছে, তা খুলে দেখুন।

লোকেরা তখনই দোকানে ঢুকে কাপড়ের ঢাকা খুলে দেখলো সত্যই একটি মরা মানুষের দেহ টাঙানো রয়েছে। আমার ভাই

বুঝতে পারলো, সে যা ভেবেছিল তা মিথ্যা নয়। বৃদ্ধ জাদুবিদ্যায় এই সব কাণ্ড করেছে।

কিন্তু অন্য লোক তা বুঝবেই বা কেন? তারা আমার ভাইকে মারতে-মারতে রাজদরবারে নিয়ে গেল। রাজা সকলের সাক্ষ্য নিয়ে আমার ভাইকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। তাকে বেত মেরে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হলো।

সেই ভাই এখন গোপনে আমার বাড়িতেই বাস করছে।

জাঁহাপনা, এবার আমার পঞ্চম ভাইয়ের কাহিনী শুনুন—তার নাম আলনস্কর! আমার বাবা মারা যাবার পর সে কাঁচের পুতুলের দোকান খুলে বসলো। একদিন সে দোকানে বসে নিজের মনে মনে বলতে লাগলো, ওই পুতুল বিক্রি করে যে লাভ হবে, তা দিয়ে আরো অনেক পুতুল কিনবো এভাবে অনেক টাকা জমা হবে। তখন উজিরের মেয়েকে বিয়ে করবো। সেই মেয়ে যদি আমার কথা না শোনে; তা হ'লে আমি তাকে এমনভাবে লাথি মারবো—বলতে-বলতে সত্যি সে লাথি মেরে বসলো। আর সেই লাথির চোট্টা পুতুলের ঝুড়িটায় লেগে সব পুতুল ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

পাশের দোকানের দরজী তা দেখতে পেয়ে হেসে উঠলো। বললো—ওহে, তুমি উজিরের মেয়েকে যেভাবে লাথি দিয়েছ, আমি উজিরের কাছে গিয়ে বলে দেবো!

আমার ভাই সে কথা শুনে খুব ভয় পেল। তারপর যখন দেখলো তার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, তখন সে কাঁদতে লাগলো। দেখতে-দেখতে অনেক লোক জমে গেল।

ভিড়ের মধ্য হতে একজন লোক আমার ভাইকে কিছু টাকা দিয়ে বললো—তুমি আবার ব্যবসা করো।

এদিকে এক বুড়ীর মনে দুষ্ট বুদ্ধি জাগলো। সে ভাবলো—ওই টাকাটা ঠকিয়ে নেবে। তাই লোকজন চলে যাওয়ার পর ভাইকে জিজ্ঞেস করলো—তুমি কোনো সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে চাও?

আমার ভাই বুড়ীর কথায় ভুলে গেল। তার সঙ্গে গিয়ে হাজির

হলো এক বাড়িতে! বুড়ী একটি ঘরে তাকে বসিয়ে রেখে ভিতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর যখন আবার ফিরে এলো তখন তার সঙ্গে এক সুন্দরী স্ত্রীলোক।

আমার ভাই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথা বলছে, এমন সময় একটি কালো লোক এসে হঠাৎ তাকে আক্রমণ করলো। স্ত্রীলোকটি চীৎকার করে পালিয়ে গেল।

কালো লোকটি আমার ভাইয়ের কাছ থেকে সব টাকা কেড়ে নিয়ে তাকে একটি ঘরে বন্দী করে রাখলো। রাত্রিবেলায় অনেক কষ্টে সে পালিয়ে এলো সেই ঘর থেকে।

আমার ভাই সে ঘটনার কথা ভুললো না। একদিন গোপনে সেই বাড়ীতে গিয়ে সেই কালো লোকটিকে আর বুড়ীকে খুন করলো।

কিন্তু তার কপাল মন্দ। ধরা পড়ে কাজীর বিচারে তার এক-কানকাটার আদেশ হলো। সেই থেকে আলনস্কর একটি কানহারা।

জাহাপনা, এবার আমার ষষ্ঠ ভাইয়ের কাহিনী শুনুন। তার নাম দিল সাকাবাক। ভিক্ষে করে সে দিন চালাতো। একদিন ভিক্ষা করবার জন্য সে এক ধনীর বাড়িতে উপস্থিত হলো। বাড়ির মালিক তাকে জিজ্ঞেস করলে—তুমি ভিক্ষা করো কেন?

সাকাবাক তার দুঃখের কথা বলায় পর লোকটি বললে—এবেলা আমার বাড়িতে আহার করবে।

সাকবাক আনন্দের সঙ্গে রাজী হলো। লোকটি একজন চাকরকে বললো—হাত-মুখ ধোবার জল নিয়ে আয়।

কিন্তু কেউ জল নিয়ে এলো না। অথচ লোকটি এমন ভাবভঙ্গি করতে লাগলো, যেন সে হাত-মুখ ধুচ্ছে। সাকাবাকও তার দেখাদেখি তাই করলো। তারপর আহারের পালা। পাশাপাশি দু'টি আসনে দু'জনে খেতে বসলো। কিন্তু কি আশ্চর্য! আসনই শুধু আছে, জল নেই, খাবার জিনিসও নেই। অথচ লোকটি খাওয়ার ভাবভঙ্গি করতে লাগলো এবং মাঝে-মাঝে রান্নার সুখ্যাতিও করতে লাগলো। সাকাবাক আর কি করবে! সে-ও তাই করতে লাগলো।

লোকটি তখন বললো—সাবাস! আমি এতদিনে আমার মনের মতো সাকরেদ পেলাম। আজ থেকে তুমি আমার ঘরে থাকবে।

সাকাবাক সেখানেই রইলো। কয়েকবছর বেশ আরামেই কাটলো দিন। তারপর হঠাৎ লোকটি মারা গেল। আবার সে বেকার। তখন একদিন সাধুর সঙ্গে সাকাবাক তীর্থযাত্রা করলো।

কিন্তু ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা। সে পড়লো একদিন ডাকাতের হাতে ডাকাতের সর্দার তাকে নিজের বাড়িতে চাকর হিসাবে রাখলো। সাকাবাক খুব গল্প করতে ভালবাসতো! একদিন ডাকাতের স্ত্রীর সঙ্গে সে গল্প করছে, এমন সময় ডাকাত দেখতে পেয়ে ভয়ানক ক্ষেপে গেল। গল্প করার অপরাধে সাকাবাকের ঠোঁট দু'টি কেটে তাকে তাড়িয়ে দিলো।

জাঁহাপনা, এই আমার ছয় ভাইয়ের কাহিনী।

গল্প শেষ করে দরজী কাসগরের রাজাকে বললো—জাঁহাপনা, আমি নিমন্ত্রণ সভায় আহার করে ও গল্প শুনে সবেমাত্র দোকান খুলেছি, এমন সময় দেখলাম এক কুঁজো বেহালা বাজিয়ে গান করছে।

তার চেহারা দেখে ও গান শুনে আমার খুব মজা লাগলো। তাকে বাড়িতে নিয়ে গেলাম। তার গান শুনে আমার বৌ খুব খুশী হলো। তাকে খাবার জন্য অনুরোধ করলাম। সে খেতে বসলো। কিন্তু তখনই ঘটলো বিপদ। গলায় মাছের কাঁটা ফুটে কুঁজো মারা পড়লো। আমি ভয়ে ইহুদী চিকিৎসকের দরজায় তাকে ফেলে এলাম।

কাসগরের রাজা গল্পটি শুনে সকলকে ক্ষমা করলেন। দরজীকে বললেন—তুমি সেই নাপিতকে আমার এই সভায় এনে হাজির করো।

দরজী সেই মৌনী নাপিতকে রাজসভায় হাজির করলো। নাপিত কুঁজোর মৃতদেহ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো—এর কি হয়েছিল?

রাজা নাপিতকে কুঁজোর মরার কারণ খুলে বললেন। নাপিত তখন কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো, তারপর তার নরুণটি দিয়ে কৌশলে কুঁজোর গলার ভিতর থেকে কাঁটাটা খুলে ফেললো।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল কুঁজো একটু নড়ছে। তারপর সে উঠে

বসলো। রাজা তখন নাপিতকে অনেক পুরস্কার দিলেন।

এভাবে একটি গল্প শেষ হয়, দুনিয়ারজাদী আর একটি গল্প শোনার জন্য বায়না ধরে। রাজা শারিয়ারেরও গল্প শোনার শখ মেটে না। এর-পর একদিন শাহারজাদী শুরু করলো হারুণ-অল-রসিদ ও ভিক্ষুকের গল্প।

* * *

বাগদাদের সুলতান হারুণ-অল-রসিদের রাজত্বকালে চুরি, ডাকাতি, খুন এই সব খুব কম হতো। কারণ সুলতান মাঝে-মাঝেই রাত্রিতে ছদ্মবেশে নগরের অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন রাত্রে হারুণ-অল-রসিদ তাঁর মন্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে একটি পুলের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখলেন এক অন্ধ ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইছে। সুলতান ভিক্ষুকের হাতে একটি সোনার মুদ্রা দিলেন। ভিক্ষুক তখন বললো—হুজুর, আপনি দয়া করে যখন আমাকে ভিক্ষা দিয়েছেন, তখন আর একটি অনুরোধ ভিক্ষা দিন।

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন—আর কি ভিক্ষা চাও?

ভিক্ষুক বললো—আমার মাথায় খুব জোরে একটা ঘুষি মারুন।

সুলতান অবাক হয়ে বললেন—এ কেমন ভিক্ষা? তোমার এ প্রার্থনা আমি পূরণ করতে পারব না।

ভিক্ষুক বললো—তবে আপনার দান ফিরিয়ে নিন, এ দানে আমার প্রয়োজন নেই।

সুলতান তখন ভিক্ষুকের মাথায় খুব আস্তে একটি ঘুষি মারলেন। তারপর বললেন—ভিক্ষুক দান ফিরিয়ে নিতে নেই, তাই তোমার প্রার্থনা পূরণ করলাম।

তারপর সুলতান ভিক্ষুককে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—কাল তোমাকে আমার লোক এসে রাজসভায় নিয়ে যাবে। সেখানে-তোমার অদ্ভুত প্রার্থনার কারণ বলতে হবে।

ভিক্ষুক সুলতানকে অভিবাদন জানিয়ে বললে—জাঁহাপনা, আমি নিশ্চয় যাবো।

সুলতান ও মন্ত্রী এরপর ঘুরতে-ঘুরতে শহর ছেড়ে অনেক দূরে গিয়ে

পৌছলেন। এক জায়গায় একটি বিরাট অট্টালিকা দেখতে পেয়ে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন—উজীর, বলতে পারো, এমন বিরাট অট্টালিকা কার?

মন্ত্রী জবাব দিলেন—জাঁহাপনা, আমার তা জানা নেই। যদি বলেন, তবে সন্ধান নিয়ে আসতে পারি।

সুলতানের অনুমতি নিয়ে মন্ত্রী সেই বাড়ীর কাছে গিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু বাড়িতে কোন জন-মানুষের সাড়া পাওয়া গেল না। এমন সময় একজন পথিককে দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মিঞা সাহেব, আপনি কি বলতে পারেন, এই বাড়ির মালিক কে?

পথিক কিছুক্ষণ মন্ত্রীর দিকে অবাক ভাবে তাকিয়ে বললো—আপনি খোজা হোসেন দড়িওয়ালার নাম শোনেন নি?

মন্ত্রী বললেন—আমরা বিদেশী, তার নাম জানি না। তাই জিজ্ঞেস করছি।

পথিক বললো—খোজা হোসেন আগে খুব গরীব ছিল। দড়ি বেচে কোন রকমে জীবনধারণ করতো। কিন্তু কেমন করে সে এত বড় বাড়ি তৈরী করলো তা জানিনা।

মন্ত্রী সুলতানের কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন। সুলতান তখন বললেন—খোজা হোসেনকে কাল আমার দরবারে উপস্থিত হবার জন্য বলে এসো।

মন্ত্রী তখন বাড়ীর ভিতর ঢুকে দ্বাররক্ষীর মারফৎ খোজা হোসেনের কাছে সম্রাটের আদেশ পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর সুলতান ও মন্ত্রী রওনা হলেন বাগদাদের দিকে। পথে দেখলেন একটি লোক তার ঘোড়াকে ভীষণ ভাবে প্রহার করছে।

সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন—লোকটা এমনভাবে ঘোড়াটাকে মারছে কেন?

মন্ত্রী এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন—ও সাহেব, ঘোড়াটাকে অমন ভাবে মারছেন কেন?

মন্ত্রীর কথার কোন জবাব না দিয়েই লোকটি ঘোড়াটাকে মারতেই লাগলো। মন্ত্রী বললেন—মিঞা সাহেব ক্ষান্ত হোন, ঘোড়াটাকে মারবেন না।

লোকটি তবুও ক্ষান্ত হলো না। মন্ত্রী তখন সুলতানকে গিয়ে সব কথা জানালেন। সুলতান বললেন, কাল তাকেও আমার দরবারে হাজির হবার জন্য আদেশ জানিয়ে এসো।

মন্ত্রী লোকটিকে সুলতানের আদেশ জানাতেই লোকটি ভয় পেয়ে গেল। সে আর ঘোড়াটিকে না মেরে সুলতানের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলো।

পরদিন দরবারের কাজ শেষ হতেই হারুণ-অল-রসিদ আগের দিন রাত্রের সেই লোক তিনটিকে সভায় হাজির করবার জন্য আদেশ দিলেন। লোক তিনটি আগেই এসে পৌছেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দরবারে এসে হাজির হলো।

সুলতান প্রথমে অন্ধ ভিক্ষুককে তার কাহিনী জিজ্ঞেস করলেন। অন্ধ ভিক্ষুক তার গল্প শুরু করলো—জাঁহাপনা, আমার বাবা একজন বণিক ছিলেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বাণিজ্যে উন্নতি করতে পারেন নি। সেই দুঃসময়ের মধ্যেই আমার জন্ম। তাই আমার লেখাপড়া শেখা হলো না। বড় হয়ে ব্যবসায়ে নেমে পড়লাম। কিন্তু কোন উন্নতি করতে পারলাম না। অনেক কষ্ট করে পিতা-পুত্রে বাণিজ্য করে কতকগুলি উট কিনলাম।

ভাবলাম, এবার উন্নতি হবে! কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, কিছুদিন পরেই বাবার ভয়ানক অসুখ হলো। অনেক চিকিৎসা করেও ফল হলো না। বাবা মারা গেলেন।

অতি কষ্টে বাবার সৎকার করলাম। যা কিছু ধন সঞ্চিত ছিল, বাবার চিকিৎসা ও সৎকারেই শেষ হয়ে গেল। ঘরের বাসনপত্র বিক্রি করে কিছুদিন চললো। তারপর যখন আর কোন উপায় রইলো না, তখন উটগুলি অন্য সব বণিকদের কাছে ভাড়া দিলাম।

এভাবে কিছু রোজগার হতে লাগলো। কয়েক বছরের মধ্যে আমি অনেকগুলি উট কিনে ফেললাম। সবশুদ্ধ আমার আশীটি উট হলো। সমস্ত উট ভাড়া খাটাতে আরম্ভ করলাম।

একদিন কোন এক বণিকের কাছ থেকে কতগুলি উট নিয়ে ফিরছি,

এমন সময় দেখলাম পথের ধারে গাছের তলায় একজন ফকির বসে আছে। ধীরে-ধীরে তার কাছে আমি এগিয়ে গেলাম—যদি আমার দুর্দশার কোন প্রতিকার সে করতে পারে।

ফকিরের কাছে গিয়ে হাজির হতেই সে আমাকে ইসারা করে তার পাশে বসতে বললো। আমি তার কাছে বসে মনের সব কথা খুলে বললাম। ফকির আমার দুঃখের কথা শুনেও হেসে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো—তুই আমার কাছে কি চাস ?

আমি বললাম—যাতে আমি অনেক টাকা রোজগার করতে পারি তার উপায় বলে দাও।

ফকির বললো—আমি তা বলে দিতে পারি। কিন্তু তুই কি তার সদ্‌ব্যবহার করতে পারবি ?

আমি ফকিরের পা জড়িয়ে ধরে বললাম—তুমি যে ভাবে আমাকে ব্যয় করতে বলবে আমি, সে ভাবেই ব্যয় করবো।

ফকির বললো—কাল সকাল বেলা তোর আশীটি উট ভাল করে সাজিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসবি।

পরদিন ভোরে আমি ভাল করে উটগুলি সাজিয়ে নিয়ে ফকিরের কাছে উপস্থিত হলাম। ফকির বললো—আমার সঙ্গে চল্।

আমি ফকিরের সঙ্গে চললাম। কত বন-জঙ্গল-গ্রাম পাহাড় অতিক্রম করে এসে পৌঁছলাম একটা বড় পাহাড়ের কাছে। ফকির সেই পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে কি যেন বললো। অমনি দেখলাম পাহাড়ের গা ফাঁক হয়ে গেল।

ফকির বললো—উটগুলিকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে যা।

আমার আগেই ফকির গহ্বরে ঢুকে পড়েছিল। আমি ঢুকতেই সে আঙুল দিয়ে গহ্বরের অন্যদিক দেখিয়ে দিল। সেদিকে তাকাতেই আমার চোখ ঝলসে গেল। মণি, মুক্তা, হীরা, জহরৎ, সোনা চারদিকে ছড়ানো। সেই ভাণ্ডার শেষ করতে কত হাজার উটের দরকার কে জানে।

আমি কল্পনাও করি নি, যে এত ধন-রত্ন পাহাড়ের মধ্যে এ ভাবে থাকতে পারে। আমার মনে হলো ফকির হয়তো কোন মন্ত্রের জোরে

আমাকে এসব দেখাচ্ছে। কিন্তু মুহূর্তেই সেই সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

ফকির বললে—যত পারো, উটের পিঠে বোঝাই করো।

প্রথমে ছিল সোনা, আমি সেগুলি থলেতে ভরে উটের পিঠে চাপাতে লাগলাম। দু'টি উট যে ভার বইতে পারে আমি ততটা ভার এক-একটি উটের পিঠে চাপালাম। ফকির আমার কাণ্ড দেখে হাসতে লাগলো।

যখন চল্লিশটি উট বোঝাই করা হয়েছে, তখন ফকির আমার কাছে বাকী চল্লিশটি উট চাইলো। যার জন্য এত ঐশ্বর্য পেয়েছি, তাকে উট না দেওয়া নিতান্ত অন্যায়, তাই ফকিরকে চল্লিশটি উট দিলাম।

ফকির দশটি উটের পিঠে মণি বোঝাই করলো। তারপর অন্য দশটি উটে মুক্তা, দশটি উটে হীরা আর শেষ দশটি উটে জহরৎ বোঝাই করলো। আমি কিন্তু চল্লিশটি উটেই শুধু সোনা বোঝাই করেছিলাম।

উটগুলি সব বোঝাই হলে ফকির বললো—এবার বেরিয়ে এসো। নিজেও সে গুহার অপরদিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলো একটি সুন্দর কারুকাজ করা সোনার বাক্স হাতে নিয়ে। সেটা নিজের বগলের ভেতর রাখলো।

তারপর পাহাড়ের নীচের দিকে দাঁড়িয়ে ফকির মন্ত্রপাঠ করতে লাগলো। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, পাহাড় আবার আগের মত এক হয়ে গেল। ফাঁক হয়ে যাওয়ার কোন চিহ্নই দেখা গেল না।

ফকির বললো—দেখলে তো, পাহাড় ফাঁক করে ভেতরে ঢুকতে পারা যায়? তবে আমি ছাড়া আর কেউ তা পারবে না।

এবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো। ফকির চল্লিশটি উট নিয়ে চললো বিপরীত দিকে। কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হলো ফকিরের যদি আবার দেখা না পাই, তাহ'লে ওই ধনভাণ্ডার থেকে তো আর কিছুই পাওয়া যাবে না। কিন্তু ফকিরের যখন ইচ্ছা হবে, তখনই সে ধনরত্ন নিতে পারবে। কাজেই আরও কয়েকটি উট যদি আমি নিতে পারি, তা'হলে জীবনে আমার কোন অভাব হবে না।

আমার মতিভ্রম ঘটলো! আমি ফকিরের কাছে ছুটে গিয়ে বললাম—ফকির সাহেব, আমি শুধু সোনাই নিয়েছি, আর তো কিছু

নেই নি। তুমি দয়া করে যে কোন দশটি উট আমাকে দাও।

ফকির আমার কথায় মোটেই বিরক্ত হলো না। সে বললো—মণিমুক্তা পাও নি বলে যদি তোমার লোকসান হয়েছে মনে করো তাহলে যে কোন দশটি উট তুমি নিতে পারো।

আমি হীরে বোঝাই দশটি উট বেছে নিয়ে রওনা হলাম। ফকির যে অত সহজে দশটি উট আমাকে ফিরিয়ে দেবে তা ভাবতে পারিনি। বিনা বাধায় দশটি উট পেয়ে আমার লোভ আরও বেড়ে গেল। ফকির কিছুদূর যেতেই আমি আবার তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ফকির আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো—একি, তুমি আবার কেন এলে?

আমি বললাম—তুমি ফকির মানুষ, ধনরত্ন নিয়ে তোমার কোন দরকার নেই। কেন অনর্থক এত ধনরত্ন নিয়ে বিপদে পড়বে?

ফকির হাসতে-হাসতে বললে—আমার বিপদের জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তোমার আসবার কি কারণ তাই বলো।

আমি বললাম—তুমি দয়া করে আমাকে আরও দশটি উট দাও।

ফকির বললো—বেশ, তুমি আবার বেছে নাও।

আমি আরও দশটি উট বেছে নিলাম। সবশুদ্ধ আমার ষাটটি উট হলো। তবু আশা মিটলো না। আবার ফকিরের কাছে ছুটে গেলাম! গিয়ে বললাম—ফকির সাহেব আর দশটি উট যদি আমাকে দিতে তা'হলে ভালো হতো।

ফকির কোন কথা না বলে দশটি উট আমাকে দিয়ে দিল সত্তরটি উট নিয়েও আমার আশা মিটলো না। কিছুদূর এসে আবার ফকিরের কাছে ছুটে গেলাম। বললাম—ফকির সাহেব, তুমি তো যখন ইচ্ছা করবে, তখনই পাহাড় থেকে ধনরত্ন নিতে পারবে। কিন্তু তোমাকে না পেলে আমার তো নেবার কোন উপায়ই নেই। কাজেই তোমার কাছ থেকে ঐ দশটি উট আমি ভিক্ষা চাইছি।

ফকির বললে—বেশ, তাতে যদি তুমি খুশি হও নিয়ে যাও।

ফকির যদি আমাকে প্রথমবার উট না দিয়ে তাড়িয়ে দিত, তাহলে আমার এই অবস্থা হতো না। কিন্তু বার-বার চেয়ে আমার লোভ

বেড়েই চললো। তবু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম দেখে ফকির জিজ্ঞেস করলো—ওহে বণিক, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমার সব উটই তো ফিরিয়ে দিয়েছি।

আমি বললাম—তুমি পাহাড়ের গুহা থেকে বের হবার সময় যে সোনার একটি বাক্স এনেছিলে, তাতে কি আছে তা জানবার জন্য আমার কৌতূহল হচ্ছে।

ফকির বললে—সেই বাক্সে একরকম তেল আছে, সেই তেল যদি কেউ বাঁ চোখে একবার মাত্র লাগায়, তা'হলে সে সমগ্র পৃথিবীর ধনভাণ্ডার দেখতে পাবে। কিন্তু ডান চোখে লাগালে একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু আমার লোভ তখন এত প্রবল হয়ে উঠেছে, যে পৃথিবীর ধনভাণ্ডার দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

বললাম—তুমি আমার বাঁ চোখে ঐ তেল লাগিয়ে দাও।

ফকির সোনার বাক্স খুলে আমার বাঁ চোখে সেই তেল লাগিয়ে দিল। আমি দেখলাম, সত্যি আমার চারিদিকে শুধু ধনভাণ্ডার। কত মণিমুক্তা, হীরা-জহরৎ—তার কোন শেষ নেই। এসব দেখতে-দেখতে আমার ডান চোখে যন্ত্রণা হতে লাগলো। ফকিরকে বললাম—তুমি আমার ডান চোখেও তেল লাগিয়ে দাও। এক চোখ বন্ধ করে আর থাকতে পারছি না।

ফকির বললে—ও চোখে তেল লাগিও না, তোমার ক্ষতি হবে।

কিন্তু আমি যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি নিজের হাতেই ডান চোখে তেল লাগিয়ে দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গেই আমার দু'চোখ অন্ধ হয়ে গেল। চারিদিকে শুধু অন্ধকার দেখতে লাগলাম। ফকির আশীটি উটের পিঠে বোঝাই করা সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে চলে গেল! যাবার সময় আমাকে বললো—বণিক, তোমাকে আমি আগেই সাবধান করেছিলাম। তুমি না শুনে নিজেই তার সাজা পেলে।

ফকির চলে যাবার পর আমি সেখানে বসে-বসে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলাম। এমন সময় কয়েকজন পথিক আমাকে দেখতে

পেয়ে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল। সেই থেকে আমি অন্ধ। আমি সেদিনই প্রতিজ্ঞা করলাম—ভিক্ষা নেবার আগে কেউ যদি আমাকে প্রহার না করে, তাহ'লে আমি ভিক্ষা নেবো না। জাঁহাপনা, সেইজন্যই আমাকে ঘুষি মারবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম।

হারুণ-অল-রসিদ অন্ধের কাহিনী শুনে তার মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন। বললেন—তোমার আর ভিক্ষা করার দরকার নেই।

সেদিন থেকে অন্ধকে আর ভিক্ষা করতে হতো না।

হারুণ-অল-রসিদ এবার হোসেন দড়িওয়ালাকে ডাকলেন। বললেন—তুমি সামান্য দড়ি বিক্রী করে দিন কাটাতে। কি ভাবে এমন বিরাট অট্টালিকা করলে বলো দেখি?

হোসেন হাত জোড় করে সুলতানকে বললো—জাঁহাপনা, আমার জীবনে যা ঘটেছিল, তা সবই বলছি শুনুন। আমার বাবা ছিলেন সাধারণ গৃহস্থ। তিনি দড়ির ব্যবসা করে কোনরকমে সংসার চালাতেন। আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র সন্তান। অল্প বয়সে বাবা মারা গেলেন। তখন সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পড়লো আমার উপর।

বাবা বিশেষ কিছু রেখে যাননি। সামান্য একখানি দোকান আর কিছু টাকা সম্বল ছিল। তাই নিয়ে ব্যবসা করতে গেলাম, কিন্তু সুবিধে হলো না। তবু কি করে আমার উন্নতি হলো, সে কথাই বলছি।

সাদ ও সাদী নামে দুই বন্ধু শহরে বাস করতো। সাদী ছিল অনেক টাকাওয়ালা লোক, সব সময় ভাবতো নিজের চেষ্টায় সে এত টাকা করেছে। সাদ ছিল গরীব, তবু সংসারে তার কোন কষ্ট ছিল না। সে সব সময় ভাবতো, ভাগ্যে না থাকলে কিছুই হয় না। সেজন্য দুই বন্ধুতে মাঝে-মাঝেই তর্ক-বিতর্ক হতো।

একদিন সাদী বললো, গরীব লোকেরা টাকার অভাবে কাজ করতে পারে না বলেই ধনী হতে পারে না। যদি কোন চতুর ও পরিশ্রমী লোক ব্যবসা চালাবার জন্য অনেক টাকা পায়, তা'হলে ধনী হয়ে উঠতে পারে।

সাদ প্রতিবাদ করে বললো—না, তা নয়। কেউ অনেক টাকা নিয়ে বাণিজ্যে যায়, কিছুকাল পরে সব কিছু হারিয়ে চলে আসে। আবার

কেউ খালি হাতে গিয়ে অনেক টাকা নিয়ে ফেরে। এর কারণ কি?

সাদী বললো—যে অনেক টাকা নিয়ে বাণিজ্যে গিয়েছিল, সে তেমন চতুর নয়, তাই সব নষ্ট করেছে। যে খালি হাতে গিয়েছিল সে পরিশ্রমী ও চতুর। তাই অনেক লাভ করে নিয়ে ঘরে ফিরেছে।

সাদ বললো—তা সত্য নয়। পরিশ্রম ও চেষ্টা করলে যে অর্থ উপার্জন হয় না, তা বলছি না। তবে ভাগ্যের দ্বারা যেমন হয়, চেষ্টায় তেমন হয় না। তুমি যে এত টাকা করেছে তা কি শুধু চেষ্টার ফলে?

সাদী বললো—নিশ্চয়ই। আমি নিজের চেষ্টায় করছি। নিজের চেষ্টায় যে কোন লোক আমার মত হতে পারে, তা প্রমাণ করতে পারি।

সাদ বললো—কি ভাবে প্রমাণ করবে?

সাদী বললো—চলো, আমরা দু'জনে খোঁজ করে একজন প্রকৃত চেষ্টাশীল গরীব বণিককে টাকা দিয়ে সাহায্য করবো, তা'হলে আমাদের তর্কের মীমাংসা হবে।

সাদ বললো—বেশ তাই হোক—এই বলে তারা দুই বন্ধুতে বের হলো। ঘুরতে-ঘুরতে এসে হাজির হলো আমার দোকানে। আমি তখন নিজে দড়ি তৈরি করছিলাম। তারা এসে ব্যবসার সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

আমি কিভাবে দড়ি তৈরী করে বিক্রি করি এবং কষ্টে সংসার চালাই তা সব খুলে বললাম। সাদী তা শুনে সাদকে বললো—এই হচ্ছে প্রকৃত লোক। একেই আমি সাহায্য করবো।

সাদী দু'শো স্বর্ণমুদ্রা আমাকে দিয়ে বললো—হোসেন, এই টাকা তোমার কারবারে খাটাও। এর দ্বারাই তুমি উন্নতি করতে পারবে।

আমি একসঙ্গে এত স্বর্ণমুদ্রা কখনও দেখিনি। তাই সাদীকে বললাম—আপনার দেওয়া অর্থে আমি ব্যবসায়ে উন্নতি করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

দুই বন্ধু চলে গেল। আমি দশটি মুদ্রা বাইরে রেখে বাকি সব মুদ্রাগুলি মাথার পাগড়ির মধ্যে রাখলাম। বাজারে গিয়ে দশটি মুদ্রা থেকে কিছু পাট কিনলাম।

পেয়ে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল। সেই থেকে আমি অন্ধ। আমি সেদিনই প্রতিজ্ঞা করলাম—ভিক্ষা নেবার আগে কেউ যদি আমাকে প্রহার না করে, তাহ'লে আমি ভিক্ষা নেবো না। জাঁহাপনা, সেইজন্যই আমাকে ঘুষি মারবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম।

হারুণ-অল-রসিদ অন্ধের কাহিনী শুনে তার মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন। বললেন—তোমার আর ভিক্ষা করার দরকার নেই।

সেদিন থেকে অন্ধকে আর ভিক্ষা করতে হতো না।

হারুণ-অল-রসিদ এবার হোসেন দড়িওয়ালাকে ডাকলেন। বললেন—তুমি সামান্য দড়ি বিক্রী করে দিন কাটাতে। কি ভাবে এমন বিরাট অট্টালিকা করলে বলো দেখি?

হোসেন হাত জোড় করে সুলতানকে বললো—জাঁহাপনা, আমার জীবনে যা ঘটেছিল, তা সবই বলছি শুনুন। আমার বাবা ছিলেন সাধারণ গৃহস্থ। তিনি দড়ির ব্যবসা করে কোনরকমে সংসার চালাতেন। আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র সন্তান। অল্প বয়সে বাবা মারা গেলেন। তখন সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পড়লো আমার উপর।

বাবা বিশেষ কিছু রেখে যাননি। সামান্য একখানি দোকান আর কিছু টাকা সম্বল ছিল। তাই নিয়ে ব্যবসা করতে গেলাম, কিন্তু সুবিধে হলো না। তবু কি করে আমার উন্নতি হলো, সে কথাই বলছি।

সাদ ও সাদী নামে দুই বন্ধু শহরে বাস করতো। সাদী ছিল অনেক টাকাওয়ালা লোক, সব সময় ভাবতো নিজের চেষ্টায় সে এত টাকা করেছে। সাদ ছিল গরীব, তবু সংসারে তার কোন কষ্ট ছিল না। সে সব সময় ভাবতো, ভাগ্যে না থাকলে কিছুই হয় না। সেজন্য দুই বন্ধুতে মাঝে-মাঝেই তর্ক-বিতর্ক হতো।

একদিন সাদী বললো, গরীব লোকেরা টাকার অভাবে কাজ করতে পারে না বলেই ধনী হতে পারে না। যদি কোন চতুর ও পরিশ্রমী লোক ব্যবসা চালাবার জন্য অনেক টাকা পায়, তা'হলে ধনী হয়ে উঠতে পারে।

সাদ প্রতিবাদ করে বললো—না, তা নয়। কেউ অনেক টাকা নিয়ে বাণিজ্যে যায়, কিছুকাল পরে সব কিছু হারিয়ে চলে আসে। আবার

কেউ খালি হাতে গিয়ে অনেক টাকা নিয়ে ফেরে। এর কারণ কি ?

সাদী বললো—যে অনেক টাকা নিয়ে বাণিজ্যে গিয়েছিল, সে তেমন চতুর নয়, তাই সব নষ্ট করেছে। যে খালি হাতে গিয়েছিল সে পরিশ্রমী ও চতুর। তাই অনেক লাভ করে নিয়ে ঘরে ফিরেছে।

সাদ বললো—তা সত্য নয়। পরিশ্রম ও চেষ্টা করলে যে অর্থ উপার্জন হয় না, তা বলছি না। তবে ভাগ্যের দ্বারা যেমন হয়, চেষ্টায় তেমন হয় না। তুমি যে এত টাকা করেছে তা কি শুধু চেষ্টার ফলে ?

সাদী বললো—নিশ্চয়ই। আমি নিজের চেষ্টায় করছি। নিজের চেষ্টায় যে কোন লোক আমার মত হতে পারে, তা প্রমাণ করতে পারি।

সাদ বললো—কি ভাবে প্রমাণ করবে ?

সাদী বললো—চলো, আমরা তু'জনে খোঁজ করে একজন প্রকৃত চেষ্টাশীল গরীব বণিককে টাকা দিয়ে সাহায্য করবো, তা'হলে আমাদের তর্কের মীমাংসা হবে।

সাদ বললো—বেশ তাই হোক—এই বলে তারা তুই বন্ধুতে বের হলো। ঘুরতে-ঘুরতে এসে হাজির হলো আমার দোকানে। আমি তখন নিজে দড়ি তৈরি করছিলাম। তারা এসে ব্যবসার সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

আমি কিভাবে দড়ি তৈরী করে বিক্রি করি এবং কষ্টে সংসার চালাই তা সব খুলে বললাম। সাদী তা শুনে সাদকে বললো—এই হচ্ছে প্রকৃত লোক। একেই আমি সাহায্য করবো।

সাদী তু'শো স্বর্ণমুদ্রা আমাকে দিয়ে বললো—হোসেন, এই টাকা তোমার কারবারে খাটাও। এর দ্বারাই তুমি উন্নতি করতে পারবে।

আমি একসঙ্গে এত স্বর্ণমুদ্রা কখনও দেখিনি। তাই সাদীকে বললাম—আপনার দেওয়া অর্থে আমি ব্যবসায়ে উন্নতি করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

তুই বন্ধু চলে গেল। আমি দশটি মুদ্রা বাইরে রেখে বাকি সব মুদ্রাগুলি মাথার পাগড়ির মধ্যে রাখলাম। বাজারে গিয়ে দশটি মুদ্রা থেকে কিছু পাট কিনলাম।

বাড়ি ফেরবার পথে একটি লোক মাংস বিক্রি করছে দেখে মনে হলো, বহুকাল আমরা মাংস খাইনি, আজ খাবো। তাই কিছু মাংস কিনে বাড়ির দিকে চললাম।

হঠাৎ একটি চিল আমার হাতের মাংসের উপর ছোঁ মারলো। আমি সতর্ক ছিলাম, তাই নিতে পারলে না। চিলটি আবার ছোঁ মারলো, সেবারেও পারলো না। কিন্তু এবার মাংসের বদলে আমার মাথার পাগড়ীটি নিয়ে উড়ে গেল।

সর্বনাশ! এ কি হলো! আমি চিলের পেছনে-পেছনে ছুটতে লাগলাম। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে চিল চোখের আড়ালে চলে গেল। আমি কপাল চাপড়াতে-চাপড়াতে ঘরে ফিরে এলাম। হায়, কেন আমি লোভ করে মাংস কিনতে গেলাম? মাংস না কিনলে তো এ অবস্থা হতো না।

পরদিন দশটি মুদ্রার যা অবশিষ্ট ছিল, তা দিয়ে আরও কিছু পাট কিনলাম। কিন্তু তাতে ব্যবসায়ের কি উন্নতি হবে? আমি আগের মতই গরীব রয়ে গেলাম।

এই ঘটনার ছয়মাস পর সাদ ও সাদী দুই বন্ধুতে আমার দোকানে এসে হাজির হলো। সাদী আমাকে বললো—এ কি হোসেন, তোমার কারবারের তো কিছুই উন্নতি হয় নি।

আমি তখন কাঁদতে-কাঁদতে সব কথা বললাম। সাদীকে দেখে মনে হলো, আমার কথা সে বিশ্বাস করতে পারে নি।

সাদ বললো—বন্ধু, দেখলে তো আমার কথা সত্য হলো কিনা?

সাদী বললো—আমি তবু হাল ছাড়বো না। আবার পরীক্ষা করবো।

সাদী আমাকে আরও দু'শো স্বর্ণমুদ্রা দিল। বললো—আমি তোমাকে আবার টাকা দিচ্ছি। এবার খুব সাবধানে ঘরে লুকিয়ে রেখো।

বন্ধু দু'জন চলে গেল। আমি দশটি মুদ্রা পাট কিনবার জন্য রেখে বাকি মুদ্রাগুলি ভূষির বস্তার মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম।

পরদিন দোকান থেকে রাত্রিবেলা ঘরে ফিরে ছুটে গেলাম ভূষির বস্তাটি দেখবার জন্যে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম বস্তাটি নেই। বুক ধড়ফড় করতে লাগলো। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম—ভূষির বস্তাটি কোথায়?

স্ত্রী বললো—কেন ? আমি সেটি সাজিমাটিওয়ালাকে দিয়ে সাজিমাটি কিনেছি।

আমি পাগলের মত চীৎকার করে বললাম—সর্বনাশ! এতদিন বস্তাটা বিক্রি করতে পার নি ? আজ তোমার বিক্রি করার সময় হলো ?

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো—কেন, কি হয়েছে ?

তখন আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। স্ত্রীও কপাল চাপড়াতে লাগলো। আমি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলাম—হায়, হায়! সবই অদৃষ্টের দোষ। নইলে বার-বার দু'বার এভাবে আমাকে সব হারাতে হবে কেন ?

এদিকে দু'মাস পরেই আবার সেই দু'বন্ধু আমার দোকানে এসে হাজির হলো। আমি লজ্জায় ভালো করে মুখ তুলতে পারলাম না। সাদী একটু রাগতভাবেই জিজ্ঞেস করলো—টাকাগুলি হারিয়ে ফেলেছ, না চুরি গেছে ?

যে ঘটনা ঘটেছিল তা খুলে বললাম। সাদ আমার কথা বিশ্বাস করলো, কিন্তু সাদী তা করলো না। সে আমাকে মিথ্যেবাদী বলেই মনে করলো। সাদ বললো—কেমন বন্ধু, তোমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে তো ?

সাদী বললো—ঠিক লোকের হাতে টাকা পড়ে নি, তাই আমার কথাটা প্রমাণ করতে পারলাম না।

সাদ বললো—এবার আমি একবার পরীক্ষা করে দেখি, তোমার কোন আপত্তি আছে কি ?

সাদী বললো—না, আমার আপত্তি নেই।

তখন সাদ আমাকে একখণ্ড সীসা দিয়ে বললো—হোসেন, এই সীসা খণ্ডটি তুমি যত্ন করে রেখে দিও, এর দ্বারা তোমার অবস্থা ফিরবে।

দুই বন্ধু চলে গেল। আমি হেলাফেলা করে সীসাটি হাতে নিয়ে স্ত্রীর কাছে গেলাম। মুচকি হেসে বললাম—এবার বন্ধুরা সোনার বদলে সীসা দিয়ে গেছে। বলে গেছে, যত্ন করে রাখলে নাকি উন্নতি হবে।

স্ত্রী বললো—আমাদের পাথর চাপা বরাতে কি আর উন্নতি আছে ? কিন্তু কি মনে করে সীসাটি যত্ন করে সে তার বাক্সে রেখে দিলো।

রাত্রে খেয়ে দেয়ে নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ শেষ রাত্রে কে যেন ডাকলো—কামাল বাড়ি আছ? ঘুম থেকে চমকে উঠে দরজা খুলে দেখলাম—আমাদের এক প্রতিবেশী জেলে দাঁড়িয়ে আছে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এত রাত্রে কি মনে করে?

জেলে বললো—আমি ভাই বড় মুস্কিলে পড়েছি। কাল সকালে একটি বড়লোকের বাড়িতে অনেকগুলি মাছ দিতে হবে। কিন্তু জাল ফেলতে গিয়ে দেখি, তাতে সীসা নেই। কি করি, অনেকের বাড়িতে গিয়ে সীসা চাইলাম। কিন্তু কারুর কাছে পেলাম না। তোমার ঘরে সীসা আছে?

আমি বললাম—হ্যাঁ, আছে।

জেলে বললো—তা'হলে দাও ভাই। খুব উপকার হবে।

আমি ভাবলাম, সীসার আর এমন কি দাম? তাই সীসাখণ্ডটি এনে জেলেকে দিয়ে দিলাম। জেলে সীসাটি হাতে নিয়ে বললো—ঠিক আমার যতটুকু দরকার, ততটুকু পেয়েছি। আমি প্রথমবার জাল ফেলে যা মাছ পাবো, তা তোমার জন্য নিয়ে আসবো।

জেলে চলে গেল। আমরা আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে একজন লোক মস্ত বড় একটি মাছ নিয়ে আমার বাড়িতে হাজির হলো। বুঝলাম, জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। যা হোক্ সীসাটি দিয়ে আমার লাভই হয়েছে, লোকসান হয়নি।

মহা আনন্দে আমার স্ত্রী মাছ কাটতে বসলো। আমি গিয়ে দোকান খুললাম। সেদিন অন্য দিনের চেয়ে বেশি বিক্রি হলো। খুশি মনে দুপুরে ফিরে এলাম। বাড়ি এসে শুনলাম, মাছের পেটের ভিতর থেকে একটা খুব চকচকে পাথর বেরিয়েছে।

ছেলেমেয়েরা পাথরটি এনে আমাকে দেখালো। আমি পরীক্ষা করে বিশেষ কিছু বুঝতে পারলাম না। ঘরে এক জায়গায় পাথরটি রেখে দেওয়া হলো। কিন্তু একি রাত্রে ঘুমুতে গিয়ে দেখি, সেই পাথরের আলোতে ঘরটি ভরে আছে।

আমার ছেলেমেয়েদের তা দেখে কি আনন্দ! তারা সেই পাথরটি

নিয়ে সারারাত খেলা করলো। তাদের কলরবে আমাদেরও ঘুম হলো না। পাশের বাড়িতে এক রত্ন ব্যবসায়ী বণিক বাস করতো। পরদিন ভোরবেলা তাঁর স্ত্রী এসে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো—দিদি, কাল রাত্রে তোমার বাড়িতে ছেলেমেয়েরা এত চেঁচামেচি করেছিল কেন?

আমার স্ত্রী বললো—সে কথা আর বলো না দিদি। কাল মাছের পেটের ভিতর থেকে একটা চকচকে পাথর বেরিয়েছে, তাই নিয়ে ওরা খেলা করছিল।

বণিকের স্ত্রী বললো—কৈ পাথরটা দেখি।

আমার স্ত্রী পাথরটা এনে তার হাতে দিল। বণিকের স্ত্রী সেটা দেখেই চমকে উঠলো। বললো—দিদি, পাথরটা আমাকে দাও, আমি তোমাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেবো।

আমার স্ত্রী মনে করলো, বণিকের বউ বোধহয় তার সঙ্গে রসিকতা করছে। কিন্তু যখন দেখলো, পাথরখানি নেবার জন্য খুব গরজ দেখাচ্ছে তখন আমার স্ত্রী বললো—না দিদি, আমার স্বামী বাড়ি না এলে কিছু বলতে পারবো না।

তখন বণিক পত্নী বললো—আমি দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি, ওটা আমাকে দাও।

আমার স্ত্রী ভাবলো, একখানা পাথরের জন্য যখন এত মুদ্রা দিতে চায়, তখন না জানি এর আসল দাম কতো। তাই বললো—না দিদি, আমার স্বামী না এলে কোন ব্যবস্থাই হবে না।

বণিক পত্ন তখন চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে রাজী হলো। আমার স্ত্রী যখন রাজী হলো না, তখন ধীরে-ধীরে দশ হাজার পর্যন্ত দাম উঠলো। তাতেও যখন হলো না, তখন বণিক পত্নী বললে—সাবধান ও পাথরখানি কাউকে দেখিও না। আমার স্বামী দুপুরবেলা এসে তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করবে—এই বলে সে চলে গেল।

দুপুরবেলা আমি বাড়ি আসতেই আমার স্ত্রী আমাকে সব কথা খুলে বললো, কিছুক্ষণ পর সেই বণিক এসে উপস্থিত হলো। বণিক পাথরখানি ভালভাবে পরীক্ষা করে বললো—হোসেন, আমার স্ত্রী তোমাকে দশ

হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে স্বীকার করেছে, সেইজন্য আমি আর কমাতে পারি না।

আমি বললাম—বেশ, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আগে কোন জহুরীকে দিয়ে এটা পরীক্ষা করাই। জিজ্ঞেস করি, সে কত টাকা দিয়ে কিনতে পারে। তারপর যে বেশি দাম দেবে, তাকেই বিক্রি করবো।

বণিক দেখলো, মহামূল্য রত্নটি হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই সে বললো—হোসেন, তোমাকে বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি, তুমি আমাকে পাথরটি দাও।

আমি বুঝলাম, পাথরটির দাম খুব বেশি। তাই চেপে বসলাম। বণিক বিশ থেকে ত্রিশ, পরে চল্লিশ থেকে নব্বই হাজার পর্যন্ত উঠলো, কিন্তু তবুও আমি পাথরটি ছাড়লাম না।

অবশেষে বণিক যেতে-যেতে বললো—হোসেন! আমি একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেবো। যদি এর থেকে বেশি দাম পাও, তা হলে তাকেই দিও।

আমি ভেবে দেখলাম, এমন মহামূল্যবান জিনিস নিয়ে দোকানে গেলে হয়তো লোকে আমাকে চোর বলে মনে করবে। বেশি লোভ করতে গিয়ে আমার বিপদও হতে পারে। তাই এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রাতেই পাথরটি বণিককে দিয়ে দিলাম।

আমার ভাগ্য খুলে গেল। অল্প দিনের মধ্যে বাণিজ্যে আরও অনেক টাকা লাভ হলো। রাজপ্রাসাদের মতো এই বাড়িটি তৈরী করলাম। চারিদিকে অনেক জমি ও বাগান কিনলাম।

ছ'মাস পরে সাদ ও সাদী আমার দোকানে এসে উপস্থিত হলো। আমি তখন দোকানে ছিলাম না। দোকানের কর্মচারীকে তারা জিজ্ঞেস করলো—হোসেন নামে একজন দড়িওয়ালা এই দোকানে থাকতো, সে কোথায় বলতে পারো?

কর্মচারী বললো—এটা তাঁরই দোকান। ঐ যে বড় বাড়িটি দেখছেন, ওই বাড়িটিও তাঁর। এখন তিনি খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করছেন।

সাদ ও সাদী বিস্মিতভাবে আমার বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলো। সেই সময়ে আমি বাইরে এসে তাদের বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলাম। তারা

আমাকে বললো—হোসেন, এমন সৌভাগ্য তোমার কেমন করে হলো ?

আমি বললাম—আপনাদের দয়াতেই হয়েছে।

সব কথা তাদের খুলে বললাম। সাদ তখন সাদীকে বললো—কেমন বন্ধু, দেখলে তো ভাগ্যই সব চেয়ে বড়ো ?

সাদী মুখে সে-কথা অস্বীকার করলেও মনে-মনে ভাবলো, তার দেওয়া টাকাতেই হয়তো আমি বড়লোক হয়েছি। কিন্তু আমি কি করে বোঝাবো, যে আমি একটুও মিথ্যা কথা বলিনি।

আমি দুই বন্ধুকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করলাম। তারপর আমার বাড়িতে কিছুদিন থাকবার জন্য তাদের অনুরোধ করলাম। তারা রাজি হলো। বেশ আদরেই তারা আমার বাড়িতে আছে একদিন সকালে তাদের সঙ্গে নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখলাম, বাগানের মালী একটা বড় গাছে উঠে গাছের ডাল কাটছে। মালী আমাদের দেখেই চেঁচিয়ে বললো—সরে যান, সরে যান!

হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা ডাল আমাদের সামনে পড়লো। দেখলাম সেই ডালে একটা পাখির বাসা রয়েছে। একটি পাগড়ির উপর সেই বাসাটি তৈরী। দেখেই বুঝতে পারলাম, সেটি আমারই পাগড়ি, যে পাগড়িটি কয়েকমাস আগে চিল ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি সাদীকে বললাম—দেখুন, আমার সেই হারানো পাগড়ি।

সাদী বললো—তা'হলে সেই একশো নব্বইটি মুদ্রা নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে।

সবাই কৌতূহলী হয়ে সেই পাগড়ি খুলতে গেলাম। খুলেই দেখা গেল, একশো নব্বইটি মুদ্রা যে ভাবে ছিল সে ভাবেই রয়েছে। একটিও নষ্ট হয়নি। সাদীকে বললাম—এই নিন, এই মুদ্রা আপনার।

সাদী বললো—না, এসব তোমাকে দান করেছি। দান করা জিনিস ফিরিয়ে নিতে নেই।

পরদিন আর এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলো। আমার গরু ও মোষগুলির জন্য কিছু ভূষির দরকার ছিল। এখন আমার অবস্থা ভাল হয়েছে। অনেক গরু ও মোষ এখন আমার গোয়ালে। ভৃত্য

কয়েকজন ভুষিওয়ালাকে ডেকে নিয়ে এলো। একজন ভুষিওয়ালার মাথায় দেখতে পেলাম, আমার সেই মুদ্রাভর্তি ভূষির বস্তাটি রয়েছে।

আমি সাদীকে ডেকে বললাম—ঐ'তো আমার সেই ভূষির বস্তা যেটা সাজিমাটিওয়ালাকে বিক্রি করা হয়েছিল।

সাদী বললো—তা হতে পারে। সাজিমাটিওয়ালা হয়তো সেই বস্তা ভূষিওয়ালাকে বিক্রি করেছে। কিন্তু ওতে তোমার সেই একশো নব্বইটি মুদ্রা আছে কি?

আমি তাড়াতাড়ি বস্তার মুখটি খুলে ফেললাম। এতদিনের কথা, সেই মুদ্রা আছে কিনা কে জানে। আমার বুক ধুকপুক করতে লাগলো। কিন্তু কি আশ্চর্য! অবাক হয়ে দেখলাম, ভূষির ভেতর সেই একশো নব্বইটি মুদ্রা রয়েছে।

সাদী বুঝতে পারলো, আমি মিথ্যা কথা বলিনি। এই মুদ্রাও তাকে দিতে চাইলাম, কিন্তু সে নিল না। তার কয়েকদিন পর সাদ ও সাদী নিজেদের বাড়িতে চলে গেল।

সুলতান হারুণ-অল-রসিদ হোসেনের ভাগ্য পরিবর্তনের কাহিনী শুনে মুগ্ধ হলেন। বললেন—তোমার জীবন কাহিনী বড় সুন্দর আর এতে মানুষের শেখবার অনেক কিছু আছে।

এবার যে যুবক তার ঘোড়াকে প্রহার করেছিল, সুলতান তাকে কলেন। যুবকটি কাছে এসে দাঁড়ালো। তাকে লক্ষ্য করে সুলতান বললেন—যুবক, বলো তুমি কেন অমন নির্দয়ভাবে ঘোড়াকে প্রহার করছিলে? সত্য কথা বলবে, মিথ্যা বললে শাস্তি পাবে।

যুবক বলতে লাগলো—জঁাহাপনা, আমার নাম সিনিনৌমান। আমি ধনী বণিক পিতার একমাত্র পুত্র! পিতার সঙ্গে বাণিজ্যে গিয়ে আমার অনেক জ্ঞান হয়েছিল। ছোটবেলাতেই আমি মা'কে হারিয়ে ছিলাম। তারপর বাবা মারা যাবার পর সংসারে আমার আপন আর কেউ রইলো না।

অনেক কাল পরে একটি সুন্দরী মেয়েকে আমি বিয়ে করলাম। আমাদের সমাজে বিয়ের একটি রীতি ছিল। সেই রীতি অনুযায়ী

পরদিন রূপোর কাঁটা ও রূপোর চামচ নিয়ে খেতে বসলাম। আমার বৌ কিন্তু রূপোর কাঁটা ও চামচ হাতে ধরলো না। নিজের কাপড়ের আঁচল থেকে একটি লোহার কাঠি বের করে খুঁটে-খুঁটে খেতে লাগলো। তরকারী বা মাছ স্পর্শ করলো না।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আমাদের নিয়ম অনুসারে রূপার কাঁটা-চামচ দিয়ে খেতে হবে। তুমি তা খাচ্ছ না কেন? মাছ বা তরকারি খাচ্ছ না কেন?

বৌ কোন কথার জবাব দিল না।

সেদিন খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, আমার পাশে বৌ নেই। কোথায় গেল? আশে-পাশে খুঁজে কোথাও তাকে দেখলাম না। আবার এসে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরবেলায় উঠে দেখি, বৌ আমার পাশে ঘুমোচ্ছে।

একি আশ্চর্য ব্যাপার! পরের দিনও খাবার সময় লোহার কাঠি দিয়ে সে খেতে লাগলো, মাছ বা তরকারি কিছুই স্পর্শ করলো না। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম এত সামান্য খেয়ে মানুষ কি করে বাঁচতে পারে?

সেদিন অনেক রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, বৌ বিছানায় নেই। কোথায় গেল? এদিক-ওদিক খুঁজলাম, কোথাও দেখতে পেলাম না। শেষ রাত্রে দেখলাম, আবার সে বিছানায় ঘুমুচ্ছে।

কয়েকদিন এই রকম চলতে লাগলো। একদিন রাত্রে আমি আর ঘুমোলাম না। ঘুমের ভান করে বিছানায় শুয়ে রইলাম।

রাত তখন দুপুর। বৌ বিছানা ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও চুপি-চুপি তার পেছনে-পেছনে গেলাম। অনেক দূর গিয়ে সে একটা বনের মধ্যে ঢুকলো। তখন ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগলো। বন ছাড়িয়ে সে এসে উপস্থিত হলো এক শ্মশানে।

আমি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা বিকটাকার পিশাচ একটা মরা মানুষের দেহ নিয়ে শ্মশানে উপস্থিত হলো। আমার বৌ সেটা দেখে হেসে উঠলো খিল-খিল

করে। তারপর দু'জনে মিলে সেই মরা মানুষটাকে খেতে লাগলো।

কি পৈশাচিক কাণ্ড! আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলো। ঘেন্নায় শরীর রী-রী করতে লাগলো। আমি ছুটে বাড়ি চলে এলাম।

পরদিন খেতে বসে যখন দেখলাম আমার বৌ লোহার কাঠি দিয়ে ভাত তুলে খাচ্ছে, তখন আর রাগ সামলাতে পারলাম না। বললাম—পিশাচী, মরা মানুষ যে খায়, তার মুখে এই উপাদেয় খাদ্য ভালো লাগবে কেন!

বৌ তখন খিল খিল করে হেসে উঠে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে আমার কাছে এসে বললে—তুমি কাল রাত্রে যে আমার পেছনে-পেছনে গিয়েছিলে, তা আমি জানি। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব দেখছিলে। আমার ইচ্ছে হয়েছিল, তোমার মাংসেই উদর পূর্ণ করি। শুধু তোমাকে বিয়ে করেছি বলে রেহাই দিয়েছি।

আমি ভাবলাম, তখনই ঘর থেকে পালিয়ে যাবো। কিন্তু সেই মুহূর্তে কিসের যেন জল সে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে কুকুর হয়ে গেলাম!

আমাকে কুকুর করেও পিশাচিনীর আশা মিটলো না। একটা বেত দিয়ে ভীষণভাবে প্রহার করতে লাগলো। আমি ছুটে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম। ছুটতে লাগলাম পথ দিয়ে। পথে একটা মাংসের দোকান পড়লো। দোকানদার তখন দোকানে ছিল না। সেই সময়ে দেখলাম একজন চোর এসে একখণ্ড মাংস নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

আমি তৎক্ষণাৎ চোরের কাপড় কামড়ে ধরে জোরে চেঁচাতে লাগলাম। দোকানদার আসতেই সেই চোরকে টানতে-টানতে তার কাছে নিয়ে গেলাম।

দোকানদার প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পেরে চোরকে ধরে সাজা দিল। তারপর থেকে আমাকে আদর করে থাকতে দিল তার দোকানে।

আমি প্রত্যেক মাসেই অনেক চোর ধরতাম। তাতে দোকান-দারের কাছে আমার আদর বেড়ে গেল। অনেক লোকই আমাকে কিনে নেবার জন্য আসতে লাগলো। কিন্তু মাংসওয়ালা আমাকে

পিশাচ একটা মরা মানুষের দেহ নিয়ে উপস্থিত হলো।

বেচতে রাজী হলো না।

কিছুদিন পরে এক রুটিওয়ালা অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে আমায় কিনতে চাইলো। মাংসওয়ালা লোভ সামলাতে পারলো না। রুটিওয়ালার কাছে আমাকে বিক্রি করে দিল। আমি কিন্তু রুটির দোকানে এসে আগের চেয়েও আরামে থাকতে লাগলাম।

একদিন একজন লোক এলো রুটি কিনতে। লোকটি ছিল খুব ধূর্ত। রুটি কিনে দাম দেবার সময় আসল মুদ্রার সঙ্গে কিছু জাল মুদ্রা মিশিয়ে দিল। রুটি নিয়ে লোকটি কিছুটা দূরে গিয়েছে, অমনি আমি ছুটে গিয়ে তার কাপড় কামড়িয়ে ধরলাম। লোকটিকে টানতে-টানতে নিয়ে আসতেই রুটিওয়ালা তাকে ধরে ফেললো।

তারপর আমি টাকা-পয়সা রাখবার থলিটি খুলবার জন্য দোকানদারকে ইঙ্গিত করতে লাগলাম। দোকানদার থলিটি খুলে আমার সামনে মুদ্রাগুলি ঢেলে দিল। আমি নকল মুদ্রাগুলি বেছে দোকানদারের সামনে ফেলে দিলাম।

দোকানের সামনে ভিড় জমে গিয়েছিল। সকলেই পরীক্ষা করে দেখলো কয়েকটি মুদ্রা অচল। অথচ সাধারণভাবে দেখলে কিছু বুঝবার উপায় নেই। কুকুর হওয়ার পর আমার দৃষ্টিশক্তি মানুষের চেয়েও তীক্ষ্ণ ছিল, তাই ধরতে পেরেছিলাম।

সকলে মিলে জুয়াচোরকে ভয়ানক ভাবে মারধোর করে তাড়িয়ে দিল। সেই থেকে আমার অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তির কথা লোকের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। মাঝে-মাঝেই আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য বহুলোক আসল ও নকল মুদ্রা মিশিয়ে আমার সামনে ধরতো, আমিও সেগুলি অনায়াসে বেছে দিতাম।

এরপর আমাকে কিনে নেবার জন্য লোকদের মধ্যে কি কাড়াকাড়ি! দাম ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো! শেষে এক বৃদ্ধা অনেক টাকা দিয়ে আমাকে কিনে নিল।

একটি বিরাট অট্টালিকার এক সাজানো ঘরে গিয়ে আমি উপস্থিত হলাম। এক সুন্দর যুবতী সেই ঘরে বসেছিল। বৃদ্ধা তাকে বললো—

রানী মা, এই যে সেই কুকুর। এর সুখ্যাতি লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

যুবতী কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বললো—ইনি কুকুর নন, এই শহরের এক ধনী বণিকের একমাত্র পুত্র, নাম সিদিনৌমান। এঁর পিশাচিনী স্ত্রী এঁর এরূপ শোচনীয় অবস্থা করেছে।

বৃদ্ধা বললো—রানীমা, তবে একে আপনি মুক্ত করুন।

যুবতী আমার শরীরে মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে আমি আবার মানুষের দেহ ফিরে পেলাম। তখন আমি যুবতীকে বললাম—দেবী! আজ আপনার কৃপায় আমি মানবদেহ ফিরে পেয়েছি। আপনি দয়া না করলে আমাকে চিরকাল কুকুরদেহে থাকতে হতো।

যুবতী বললো—সবই ভাগ্য। যখন আমি কুকুরের অদ্ভুত শক্তি ও বুদ্ধির কথা জানতে পারলাম তখন কুকুরটি দেখবার ইচ্ছা হলো। তাই অনেক টাকা দিয়ে কিনে এনেছি। পরে যখন বুঝতে পারলাম, একজন মানুষ কুকুরের দেহে বাস করছে, তখন মন্ত্র দিয়ে মুক্ত করলাম।

কিছুক্ষণ পর যুবতী আমাকে জিজ্ঞেস করলো—আপনি কি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান?

আমি বললাম—না। আমি তাকে শাস্তি দিতে চাই। আপনার সাহায্য ছাড়া তা হবে না!

—বলুন, আপনি কি ধরণের সাহায্য আমার কাছে চান?

আমি বললাম—পিশাচীকে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু করে দিন, তা'হলেই আমি তাকে নিজের হাতে শাস্তি দিতে পারবো।

যুবতী তখন এক পাত্র মন্ত্রপড়া জল আমার হাতে দিয়ে বললো—তার গায়ে এই জল ছিটিয়ে যা হতে বলবেন, তাই হবে।

আমি সেই জল নিয়ে বাড়িতে এসে হাজির হয়ে দেখলাম, বাড়ির একটি দাসদাসীও জীবিত নেই, পিশাচী সকলকেই মেরে ফেলেছে।

পিশাচী তখন সুন্দরী নারীর বেশ ধরে সাজগোজ করছে। আমাকে দেখেই চমকে উঠল। তারপর তেড়ে এলো আমার দিকে। আমি আর তাকে কোন সুযোগ দিলাম না। আমার হাতের পাত্র থেকে জল ছিটিয়ে তার গায়ে দিয়ে বললাম—ঘোড়া হয়ে যা।

সেই মুহূর্তে সে ঘোড়া হয়ে গেল। তারপর আমি প্রতিজ্ঞা করলাম—রোজ এই ঘোড়াকে একশো ঘা বেত মারবো। এখনও তাই করছি। জাঁহাপনা বলুন, এটা কি আমার অন্যায় ?

হারুণ-অল-রসিদ গল্প শুনে বললেন—না, অন্যায় তোমার মোটেই নয়,। যে খারাপ কাজ করে তাকে সাজা দেওয়াই উচিত। তিনি খুশী হয়ে অন্ধ, দড়িওয়ালা হোসেন আর সিদিনৌমানকে বিদায় দিলেন।

* *

শাহারজাদী গল্প শেষ করে জিজ্ঞেস করলো—কেমন গল্প ?

রাজা শারিয়ার কিছু বলবার আগেই ছুনিয়ারজাদী বললো—সত্যি কি সুন্দর গল্প। আর একটি গল্প বলো না।

—তুই শুনতে চাইলে কি হবে, রাজা যদি না শুনতে চান ?

সে-কথা শুনে শারিয়ার বললেন—তোমার যদি আরও গল্প জানা থাকে তা হলে বলো, আমি শুনবো।

—আজ থাক। ভোর হয়ে গিয়েছে, রাত্রে আবার বলবো !

পরদিন ভোর হবার অনেক আগেই আবার সে শুরু করলো গল্প।

* * *

অনেককাল আগে পারস্য দেশে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ হওয়ায় পুত্র খসরুসাকে সিংহাসনে বসালেন। কিছুদিন পর বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হলো।

খসরুসা নুতন রাজা হয়ে স্থির করলেন, তাঁর রাজ্যে কোন গরীব লোক তিনি রাখবেন না। সেজন্য প্রত্যেক দিন রাত্রে তিনি ছদ্মবেশে মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নগরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। গরীব লোকদের মধ্যে যে যে-রকম কাজ করতে পারে তাকে সেই রকম কাজ দিলেন। অনেককে টাকা পয়সা দিয়েও সাহায্য করতে লাগলেন।

কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যের অনেক উন্নতি হলো। বহু গরীব লোকের অভাব ঘুচে গেল। অন্যদিকে চোর-ডাকাতরা পড়লো ভয়ানক মুশকিলে। তারা চুরি-ডাকাতি করার কোন সুযোগ পেল না। তখন বাধ্য হয়ে অন্য রাজ্যে পালিয়ে যেতে লাগলো।

একদিন রাজা ছদ্মবেশে মন্ত্রীর সঙ্গে ঘুরতে-ঘুরতে দেখলেন একটি বাড়িতে গভীর রাত্রেও আলো জ্বলছে। তখন তাঁরা খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরে তিনটি মেয়ে বসে গল্প করছে। তিনজনেই সুন্দরী, তবে ছোট মেয়েটির রূপের যেন তুলনা হয় না।

বড় মেয়েটি বলছে—জানিস, দোকানের রুটি আমার পছন্দ হয় না। যদি রাজার বাড়ির রুটিওয়ালার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, তা'হলে প্রাণ ভরে রুটি খেতে পারবো।

বড় বোনের কথা শুনে অন্য দু'বোন হেসে উঠলো। মেজো বোন বললো—দিদি তোর দোকানের রুটি পছন্দ হয় না, আমার দোকানের কোন খাবারই পছন্দ হয় না। যদি রাজার বাড়ির খানসামার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, তা'হলে নানারকম খাবার খেয়ে শখ মিটাই।

ছোট বোন বললো—দিদি, তোদের শখ মিটবার সম্ভবনা আছে। কিন্তু আমার শখ এত বড় যে, কখনও মিটবে না।

বড় বোন জিজ্ঞেস করলো—তোর কি শখ বল্ দেখি?

ছোট বোন বললো—আমার যদি এই রাজ্যের রাজার সঙ্গে বিয়ে হয়, আর আমাদের এমন একটি ছেলে হয় যে, হাসলে মাণিক ঝরবে, কাঁদলে মুক্তা ঝরবে, তা হলে খুব ভাল হয়।

তার কথা শুনে দুই বোন হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো।

তাতে লজ্জা পেয়ে ছোট বোন বললো—কল্পনাই যখন করছি, তখন ছোট জিনিসের কল্পনা করে লাভ কি?

বাতি নিভিয়ে তিন বোনেই ঘুমিয়ে পড়লো। রাজা দূরে সরে গিয়ে মন্ত্রীকে বললেন—উজীর, আমি তিনজনেরই প্রার্থনা পূরণ করতে চাই।

মন্ত্রী বললেন—জাঁহাপনা, এ করা কি ভাল হবে?

রাজা বললেন—তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করা যাক। কাল তাদের রাজসভায় নিয়ে এসো।

পরদিন ভোরবেলা তিন বোন অবাক হয়ে দেখলো, তাদের বাড়ির সামনে রাজার শিবিকা এসে হাজির হয়েছে। সঙ্গে মন্ত্রীও এসেছেন। মন্ত্রী

মেয়েদের রাজার আদেশ জানালে তিন বোনই ভয় পেয়ে গেল।

মন্ত্রী বললেন—তোমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

তিন বোন তখন ভাল পোশাক পরে ও সেজেগুজে শিবিকায় উঠলো। মন্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে তারা হাজির হলো রাজসভায়।

রাজা তাদের জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের কার কি মনের কামনা আমার কাছে বলো, আমি তা পূরণ করবো।

রাজার কথা শুনে তিনটি মেয়েই অবাক হয়ে একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। রাজা বললেন—ভয় নেই, তোমরা নির্ভয়ে তোমাদের মনের কথা বলো।

বড় মেয়েটি তখন বললো—জাঁহাপনা, মানুষের অনেক রকম মনের বাসনা থাকে। তা কি সব লোকের সামনে প্রকাশ করা যায়?

রাজা বললেন—কাল রাত্রে তোমরা যে রকম মনের বাসনা প্রকাশ করেছিলে সেই রকমই বলো।

মেয়ে তিনটি সে-কথা শুনে যেমন অবাক হলো, তেমনি ভয়ও পেল। সর্বনাশ! কাল অনেক রাত্রে তারা যে গল্প করেছে, রাজার কানে তা কি করে গেল?

বড় মেয়েটি বললো—জাঁহাপনা, আমরা হাসি-ঠাট্টা করতে-করতে ওসব কথা বলেছিলাম।

—তা' হলে কি ওসব তোমাদের মনের কথা নয়?

তখন তারা সকলেই লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলো। বারবার অনুরোধ করার পর তারা স্বীকার না করে পারলো না।

রাজা বললেন—আজই তোমাদের মনের বাসনা পূরণ হবে

সেই দিনই বড় মেয়ের সঙ্গে রুটিওয়ালার আর মেজো মেয়ের সঙ্গে খানসামার বিয়ে হয়ে গেল। তারপর ছোট মেয়েকে রাজা নিজে বিয়ে করে তাকে রানী করলেন।

ছোট মেয়ে কখনও ভাবতে পারেনি যে, তার মনের বাসনা পূরণ হবে। দু'বোন যখন দেখলো, যে ছোট বোন সত্যি রানী হয়েছে, তখন তারা হিংসায় জ্বলতে লাগলো। তারা বলাবলি করতে লাগলো…

হায়রে, কেন আমরা রাজাকে বিয়ের কথা বললাম না ? তা'হলে তো রাজা আমাদের বিয়ে করতেন।

এদিকে নূতন রানীর রূপগুণের প্রশংসা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সকলের মুখেই নূতন রানীর সুখ্যাতি। ওদিকে বড় তু'বোন যতই ছোট বোনের প্রশংসা শোনে; ততই তাদের হিংসা বাড়ে।

কিছুদিন পর শোনা গেল—নূতন রানীর সন্তান হবে, সেজন্য রাজবাড়ির সকলেই আনন্দ করছে। বড় তু'বোন তখন গোপনে বসে নানারকম পরামর্শ করতে লাগলো।

দেখতে-দেখতে সন্তান হওয়ার দিন ঘনিয়ে এলো। সেদিন রাজার অনুমতি নিয়ে বড় তু'বোনও গিয়ে ঢুকলো আতুড় ঘরে। সময় মতো ছোট বোনের একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে হলো।

বড় তু'বোন আগেই সব ফন্দী করে রেখেছিল। তারা সেই ছেলেটিকে একটি হাঁড়ির মধ্যে পুরে সরিয়ে একটি কুকুরছানা ছোট বোনের পাশে শুইয়ে রাখলো। তারপর গোপনে সেই হাঁড়িটি নিয়ে ভাসিয়ে দিল নদীর জলে।

এদিকে রাজা সুখবর জানবার আশায় বসে আছেন। বড় বোন মুখ ভার করে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে গিয়ে বললো—জাঁহাপনা, বড় খারাপ খবর! রানীর একটি মরা কুকুরছানা হয়েছে।

রাজা সেকথা শুনে ভয়ানক রেগে গেলেন। তখনই মন্ত্রীকে ডেকে বললেন—উজীর, এখনই জল্লাদ ডেকে রানীর মাথা কেটে ফেলো।

মন্ত্রী রাজাকে বললেন—জাঁহাপনা নারীহত্যা মহাপাপ। তাছাড়া কুকুরছানা হওয়ার জন্য তো আর রানী দায়ী নন।

রাজা তখন রানীকে ক্ষমা করলেন।

এদিকে হাঁড়িটি নদীর জলে ভাসতে ভাসতে চললো। নদীর তীরে ছিল রাজার বাগান। হাঁড়িটি বাগানের মালীর চোখে পড়লো। সে কৌতূহলের বশে হাঁড়িটি জল থেকে তুলে আনলো।

হাঁড়ির ঢাকনাটি খুলে ফেলতেই তার চোখে পড়লো আশ্চর্য ব্যাপার। একটি ছোট ফুটফুটে ছেলে তার ভেতরে রয়েছে। সে

তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে তুলে বাড়ি নিয়ে এসে তার বউ-এর কোলের ছেলেটিকে দিয়ে বললো—এই নাও, তোমার ছেলে।

মালীর বউ তো সুন্দর ফুটফুটে ছেলে দেখে অবাক। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে—এই ছেলে কোথায় পেলে ?

মালী তখন সব কথা খুলে বললো, মালীর বৌয়ের তখন কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি। তাই এই শিশুটিকে পেয়ে সে খুব খুশী হলো। নিজের ছেলের মতোই তাকে লালন পালন করতে লাগলো।

ওদিকে নূতন রানী মনের দুঃখে দিন কাটায়। দিনের পর দিন এ ভাবেই কাটাতে লাগলো।

কিছুদিন পর দেখা গেল—রাজবাড়ির লোক আবার আনন্দে মেতে উঠেছে। রানীর আবার সন্তান হবে।

দেখতে-দেখতে শুভদিন এসে গেল। কিন্তু এবারও দু'বোনের মনে জেগে উঠলো দুষ্টবুদ্ধি। রাজার অনুমতি নিয়ে এবারও তারা আঁতুর ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে নিয়ে গেল একটি মরা বিড়ালছানা।

এবারও রানীর একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে হলো। কিন্তু দু'-বোন পরামর্শ করে ছেলেটিকে সরিয়ে ফেললো। বাইরে নিয়ে গিয়ে হাঁড়ির ভিতর ভরে ভাসিয়ে দিল নদীর জলে।

তারপর রাজার কাছে গিয়ে তারা জানালো—জাঁহাপনা, এবার রানীর একটি মরা বেড়ালছানা হয়েছে। সেকথা শুনেরাজার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কি ভেবে রানীকে কিছু বললেন না।

হাঁড়িটি ভাসতে-ভাসতে এবারেও রাজার বাগানের সামনে গিয়ে ঠেকলো। মালী দেখতে পেয়ে এবার হাঁড়ি থেকে ছেলেটিকে তুলে নিল। তারপর বৌয়ের কোলে দিয়ে বললো—এই নাও তোমার ছেলে।

মালীর বউ এই ছেলেটিকেও লালন পালন করতে লাগলো।

দেখতে-দেখতে কেটে গেল আরও একটি বছর। রানীর এবার একটি মেয়ে হলো। কিন্তু দুই বোন চক্রান্ত একটি মরা ইঁদুরছানা রানীর বিছানায় রেখে মেয়েটিকে জলে ভাসিয়ে দিলো। তারপর রাজার কাছে গিয়ে বললো—জাঁহাপনা, রানীর এবার মরা ইঁদুরছানা হয়েছে।

রাজা এবার আর রাগ সামলাতে পারলেন না। রানীকে নিজেই বধ করবার জন্য তলোয়ার হাতে নিয়ে ছুটলেন। মন্ত্রী ও অমাত্যরা রাজাকে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করলেন।

রাজা রানীর প্রাণ বধ করলেন না। কিন্তু তাঁকে সারা জীবন অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখার আদেশ দিলেন।

এদিকে সেই হাঁড়িটিও মালীর চোখে পড়লো। সে মেয়েটিকে নিয়ে নিজের মেয়ের মতো লালন করতে লাগলো।

কেটে গেল বছরের পর বছর। রাজার ছেলেমেয়েরা মালীর ছেলেমেয়ে বলেই লোকের কাছে পরিচিত হলো। প্রথম ছেলের নাম বাহমান, দ্বিতীয় ছেলের নাম পরভেজ আর মেয়েটির নাম পরিজাদী।

মালী ছেলে দু'টিকে নানাবিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলতে ত্রুটি করলো না। পুত্র দু'টি যখন যৌবনে পড়লো, তখন তারা রূপে, গুণে ও যুদ্ধ বিদ্যায় রাজ্যের মধ্যে অদ্বিতীয় হয়ে উঠলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুদিন পরেই মালী ও তার বউ মারা গেল।

অজানাই রয়ে গেল মেয়ে আর ছেলে দু'টির জীবনের রহস্য।

কিন্তু ইতিমধ্যে যুবক দু'জন রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। রাজা তাদের দু'জনকে নিয়ে মাঝে-মাঝেই শিকারে যান।

সেদিনও রাজা বাহমান ও পরভেজকে নিয়ে শিকার করতে বের হলেন। ঘরে রইলো একা পরিজাদী। পরিজাদী দুপুরবেলা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় এক সন্ন্যাসিনী এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন মা, আমাকে আজ রাতের মত মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা করে দাও।

পরিজাদী সন্ন্যাসিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে পরম যত্নে আহার করালো। খাওয়া শেষ হওয়ার পর সন্ন্যাসিনী পরিজাদীর কাছে বলতে লাগলেন, অনেক সুন্দর-সুন্দর গল্প। কথা বলা পাখী, গান করা গাছ আর সোনার জলের অদ্ভুত সব গল্পও বলতে লাগলো। তা শুনে পরিজাদী জিজ্ঞেস করলো—এসব কি সত্যিই পাওয়া যায়?

সন্ন্যাসিনী হেসে জবাব দিলেন—হ্যাঁ মা, সত্যিই পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়া বড় কষ্টকর। কত রাজা ও রাজপুত্র ওই সব জিনিস

পাওয়ার জন্য প্রাণ হারিয়েছে, তবুও পায়নি।

পারিজাদী বায়না ধরে বসলো—আমাকে ওর সন্ধান বলুন।

—ওসবের সন্ধান করতে যেয়ো না। পেতে হলে অনেক কষ্ট করতে হবে।

কিন্তু পরিজাদী সন্ধান জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তখন সন্ন্যাসিনী বললেন—তোমাদের বাড়ির পেছনে যে রাস্তা গিয়েছে, সেই রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে কুড়িদিন যেতে হবে। তারপর গাছের তলায় একটি কুটিরে দেখতে পাবে এক ফকির বসে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে সব বলে দেবে।

সেদিন রাত্রে সন্ন্যাসিনী সেই বাড়িতে রইলেন। বাহমান ও পরভোজ তখনও শিকার থেকে ফেরেনি। রাজার সঙ্গে শিকারে গেলে তাদের ফিরতে অনেক সময় দু'-তিন দিন দেরী হতো।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে সন্ন্যাসিনী পরিজাদীকে বললেন—মা, আমি তোমাকে যে পথের সন্ধান দিয়েছি, সেখানে যাবার চেষ্টা কোনদিন করো না। বড় কষ্ট পাবে। পরিজাদী বারণ শুনলো না। তখন সন্ন্যাসিনী তাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

তিন-চার দিন পর দু'ভাই বাড়িতে ফিরলো। বোনকে খুব চিন্তান্বিত দেখে তারা জিজ্ঞেস বললো—পরিজাদী, তোর কি হয়েছে?

পরিজাদী তখন সন্ন্যাসিনীর কথা ভাইদের কাছে খুলে বললো। তারপর বললো—দাদা, কথা বলা পাখি, সোনার রঙের জল আর গান করা গাছ আমাকে এনে দিতে হবে।

বাহমান আর পরভেজ বোনকে অনেক বুঝাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পরিজাদী কিছুতেই বুঝতে চাইলো না।

তখন বাহমান বললো, আচ্ছা দেখি আমি এনে দিতে পারি কিনা।

—পরদিন ভোরবেলা ঘোড়ায় চড়ে বাহমান রওনা হলো। সারাদিন ঘোড়া চালাতে-চালাতে রাত্রিবেলায় এক চটিতে এসে আশ্রয় নিল। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন আবার রওনা হলো ঘোড়ায় চড়ে।

এভাবে ঘোড়া চালিয়ে ও রাত্রে বিশ্রাম করে কুড়িদিন পরে একটি

গাছের তলায় সেই ফকিরকে দেখতে পেল।

ফকির তখন চোখ বুঁজে ধ্যান করছিলেন। গাছের ডালে ঘোড়াটি বেঁধে বাহমান ফকিরের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে রইলো। কিছুক্ষণ পর ফকিরের ধ্যান ভাঙলো। বাহমানকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—কি চাই?

বাহমান হাতজোড় করে বললো—প্রভু, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। কয়েকটি বিষয় জানবার আমার প্রবল আগ্রহ। যদি তা পূরণ করেন তাহলে কৃতার্থ হই।

ফকির জিজ্ঞেস করলেন—কি জিনিস জানতে চাও?

বাহমান বললো—গান গাওয়া পাখি, কথা বলা গাছ আর সোনার রঙের জল কোথায় আছে, দয়া করে তার সন্ধান বলুন।

—বাছা, ওই তিনটি জিনিস পাওয়ার আশা ত্যাগ করো। এতকাল কেউ তা পায়নি, তা-ছাড়া যারা তার খোঁজে গেছে, সকলেই মারা গেছে।

বাহমান বললো—তবু আপনি বলুন। আমি বোনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, যে ভাবেই হোক ওই জিনিস তিনটি তাকে এনে দেবো।

ফকির তখন বাহমানের হাতে গোলাকার একটি জিনিস দিয়ে বললেন—এটা খুব জোরে সামনের দিকে ছুঁড়ে দাও।

বাহমান তাই করবার জন্য তৈরি হলো।

ফকির বললেন—এটি যেদিকে যাবে তুমিও ঘোড়া নিয়ে পেছনে পেছনে যাবে। একটি পাহাড়ের কাছে গিয়ে এটি থামবে। সেই পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচু চূড়ায় গিয়ে দেখবে সোনার খাঁচায় কথা বলা পাখী আছে। তার কাছে আর দু'টি জিনিসের কথা জিজ্ঞেস করলে সেই বলে দেবে। কিন্তু সাবধান, পাহাড়ে উঠবার সময় কখনও পেছনের দিকে তাকিও না। সেই পাহাড়ে বহু রাজা, রাজপুত্র এবং সৈন্যসামন্তের দেহ পাথর হয়ে পড়ে আছে। তাদের প্রেতাত্মারা ভয়ানক ভাবে কোলাহল করবে। তা শুনে ভয় পেয়ে পেছনের দিকে তাকিও না, তা'হলে তুমিও সঙ্গে-সঙ্গে পাথর হয়ে যাবে।

বাহমান সেই গোলাকার জিনিসটি ছুঁড়ে দিল। জিনিসটি গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগলো সামনের দিকে। অনেকক্ষণ পর একটি পাহাড়ের

কাছে গিয়ে জিনিসটি থামলো।

বাহমান ঘোড়া নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলো। দেখতে পেল অনেক মানুষ ও ঘোড়া পাথর হয়ে এদিক ওদিক পড়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরই শুনতে পেল প্রবল চীৎকার! কারা যেন তাকে উপরে উঠবার জন্য বারণ কর। তবু বাহমান পেছনে দিকে তাকালো না।

ঘোড়া চলতে লাগলো। পাহাড়ের প্রায় অর্ধেক পথ উঠেছে, তখন শুনতে পেলে আরও জোর চীৎকার। সাড়া পাহাড় যেন কাঁপছে। বাহমান এবার পেছনে আর না তাকিয়ে পারলো না।

অমনি ঘটলো এক শোচনীয় কাণ্ড। মুহূর্তের মধ্যে বাহমান আর তার ঘোড়া পাথর হয়ে গেল।

এদিকে পরিজাদী দাদার পথের দিকে চেয়ে বসে আছে।

কিন্তু দিনের পর দিন চলে যায়, মাসের পর মাস চলে যায়, কেটে যায় একটি বছর। তবু বাহমান ফিরে আসে না। পরিজাদী দাদার চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। পরভেজ পরিজাদীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি দাদার খোঁজে যাচ্ছি।

পরদিনই পরভেজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে রওনা হয়ে গেল।

বিশ দিন পর গিয়ে হাজির হলো সেই ফকিরের সামনে। পরভেজ ফকিরের কাছে তার দাদার খবর জিজ্ঞেস করলো। ফকির বললেন —তোমার দাদা ও জিনিসগুলি আনতে গিয়ে মারা গেছে।

পরভেজ বললো—প্রভু, আমিও সেই তিনটি জিনিসের জন্য এসেছি। আমাকে তার সন্ধান দিন।

ফকির বললেন—ওখানে গেলে কেউ ফেরে না। তোমার দশাও তোমার দাদার মতোই হবে।

পরভেজ বললো—তবু আমি যাবো। আমাকে সন্ধান বলে দিন।

ফকির তখন পরভেজের হাতে একটি গোলাকার জিনিস দিয়ে বাহমান যেভাবে গিয়েছিল, সে ভাবেই তাকে যেতে বললেন।

পরভেজ সেই গোলাকার জিনিসটির পেছনে গিয়ে পাহাড়ের কাছে উপস্থিত হলো। তারপর ঘোড়া নিয়ে উঠতে লাগলো পাহাড়ের উপর।

পাহাড়ের উপর অনেকটা উঠে গিয়েছে, আর সামান্য কিছুটা পথ বাকি। হঠাৎ এত জোরে চীৎকার হতে লাগলো যে মনে হলো সারা পৃথিবীটা কাঁপছে। তখন পরভেজ নামবার জন্য পেছনের দিকে ফিরলো। তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার সঙ্গে সেও পাথর হয়ে গেল।

ওদিকে পরিজাদী ভাইয়ের আশায় বসে আছে, অথচ দু'জনের একজনও ফিরলো না। দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও একটি বছর। তখন সে নিজেই ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো।

বিশদিনের পথ তার যেতে লাগলো প্রায় এক মাস। ফকিরের কুটির দেখে সে ঘোড়া থেকে নামলো। ফকির একটি মেয়েকে আসতে দেখে বিস্মিত হয়ে। জিজ্ঞেস করলেন—বালিকা, তুমি কিসের জন্য এসেছো?

পরিজাদী বললো—প্রভু, আমার দু'ভাই তিনটি আশ্চর্য জিনিসের সন্ধানে আপনার কাছে এসেছিল। কিন্তু তারা কেউ ফিরে যায়নি।

ফকির বললেন—শোন বালিকা, আমি তাদের ওই জিনিস আনতে যেতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার নিষেধ শোনেনি। তাই তারা পাহাড়ে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে।

পরিজাদী সেকথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করলো—তাঁদের বাঁচবার কি কোন উপায় নেই?

—যদি পাহাড়ের উপর সোনার খাঁচায় ভরা কথা বলা পাখিকে কেউ খুশী করতে পারে, তা'হলে সেই পাখি তাদের বাঁচাতে পারে।

পরিজাদী বললো—কি ভাবে সেখানে যাবো তা আমাকে বলুন।

ফকির বললেন—আমি কাউকেই ওই মরণের পথ দেখাতে চাই না।

পরিজাদী বললো—এই দুনিয়ায় ওই দু'টি ভাই ছাড়া আমার আর কেউ নেই। কাজেই তাদের ছাড়া আমার বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। মরতে হয় মরবো, তবু আমাকে যাবার পথ বলে দিন!

ফকির পরিজাদীর কথা শুনে খুব খুশী হলেন। তাকে আশীর্বাদ করে পথের সন্ধান বলে দিলেন। পথে যে বিপদ হতে পারে, সেকথাও জানাতে ভুললেন না।

পরিজাদী ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌঁছাল।

ঘোড়াটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে পায়ে হেঁটেই পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগলো! পরনের পোশাক ছিঁড়ে কাপড় দিয়ে কান ছু'টিকে এমন ভাবে বন্ধ করলো, যাতে কোন শব্দ কানে ঢুকতে না পারে।

পাহাড়ে উঠতে না উঠতেই চারদিক থেকে ভয়ানক চীৎকার শুরু হলো। কিন্তু সেই শব্দ তার কানে ঢুকলো না। যতই সে উপরে উঠতে লাগলো, ততই কোলাহল বাড়তে লাগলো। তখন পরিজাদী ছু'হাত ছু'কান ঢেকে উপরের দিকে উঠতে লাগলো। কোন কিছুতেই সে চলা বন্ধ করলো না। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল একটি পাখি বসে আছে। তখন কোন কোলাহলও আর শোনা গেল না। খাঁচার কাছে যেতেই পাখিটি মানুষের মত গলায় বললো—ওহে বালিকা, আজ থেকে আমি তোমার বাধ্য হলাম। তুমি যা বলবে তা-ই আমি শুনবো।

পরিজাদী পাখির মুখে মানুষের মত কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। বললো—পাখি, যদি আমার কথা শোন, তাহলে যে সব লোক তোমাকে পাবার জন্য প্রাণ দিয়েছে, তাদের বাঁচিয়ে দাও।

পাখি বললো—তোমার কথায় আমি খুশী হয়েছি। তুমি সামনের পথ ধরে কিছুদূর গেলে একটা ঝরনা দেখতে পাবে। সেই ঝরনার জলের রঙ সোনার মতো। যে মানুষগুলি পাথর হয়ে গেছে, তাদের ওপর জল ছিটিয়ে দাও। তা'হলেই সবাই বেঁচে উঠবে।

পরিজাদী তখনই ঝরনার দিকে ছুটে চললো। দূর থেকেই দেখতে পেল পাহাড়ের গা বেয়ে যেন সোনার জল পড়ছে। কাছেই একটি রূপার পাত্র পড়ে ছিল। তাতে ভরে নিল সেই সোনার জল। তারপর পাহাড়ের চারদিকে জল ছিটিয়ে দিতে লাগলো।

তারপরেই ঘটলো আশ্চর্য ব্যাপার। পাথরের মূর্তিগুলি সব জীবন্ত হয়ে উঠলো। নূতন জীবন পেয়ে সবাই বিস্মিত। তারা পরিজাদীকে মনে করলো স্বর্গের কোন দেবী।

বাহমান ও পরভেজ বোনকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো। খুশীর বন্যা যেন বইতে লাগলো চারিদিকে।

যে মূর্তিগুলি জীবিত হয়েছিল, তারা একে একে নিজেদের বাড়ির

দিকে যাত্রা করলো। সবাই চলে গেলে পরিজাদী পাখিকে বললো—হে পক্ষীবর! আমি যে তিনটি জিনিসের জন্য এসেছিলাম তার মধ্যে দু'টি পেয়েছি। আমি আর একটির খোঁজ এখনও পাইনি।

পাখিটা বললো—তুমি গান জানা গাছের কথা বলছো তো? এই পাহাড়ের পশ্চিম দিকে সেই গাছ আছে। তুমিই সেই গাছের একটি ডাল নিয়ে এসো, সেই ডাল থেকেই আবার গাছ হবে!

তিনজনেই তখন পাহাড়ের পশ্চিমদিকে যেতে লাগলো। কিছুদূর যেতেই শুনতে গেল গান-বাজনার শব্দ। কাজেই গাছটি চিনতে তাদের অসুবিধা হল না। তারা গাছের একটি ডাল ভেঙে নিল।

বাহমান রূপার পাত্রে সোনার রঙের জল, পরভেজ গান জানা গাছের ডাল আর পরিজাদী কথাবলা পাখি নিয়ে ফকিরের কাছে আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। এরপর কথাবলা পাখির নির্দেশ মতোই তারা চলতে লাগলো। পাখি বললো—তোমরা বাগানের মধ্যে একটি বাড়ি তৈরী করো।

কিছুদিন পরেই বাগানে রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি উঠলো। একটি ঝরনা তৈরি করে তাতে সেই সোনার রঙের জল ঢেলে দেওয়া হলো। পাখিকে রাখা হলো সেই বাড়ির সব চেয়ে সুন্দর একটি ঘরে। বাগানের মাঝখানে গানগাওয়া গাছটাকে পোঁতা হলো।

এবার পাখি বললো—রাজাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসো।

বাহমান ও পরভেজ রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। অনেক দিন পর রাজা তাদের দেখতে পেয়ে খুশি হলেন। বাহমান ও পরভেজ রাজাকে তাদের বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করে সঙ্গে নিয়ে এলো।

দূর থেকে বাগানের মধ্যে এত বড় বাড়ি দেখে রাজা অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন—এ বাড়ি কার?

বাহমান বললো—এ বাড়ি আমরাই তৈরি করেছি। ভিতরে চলুন, সব ঘটনা শুনবেন। ভিতরে ঢুকে বাড়ির সাজসজ্জা দেখে রাজা প্রশংসা করলেন। পরিজাদী এসে রাজাকে অভিবাদন করলো।

বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখে রাজা বাগানে এলেন। বাগানের সামনেই

সোনার জলের ঝরনা দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। বললেন—মানুষ কি এমন ঝরনা তৈরী করতে পারে?

একটু পরে গান বাজনার শব্দ তাঁর কানে এলো। তিনি অবাক হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কারা গান করছে?

পরিজাদী বললো—জাঁহাপনা, আপনি যে গান-বাজনা শুনছেন তা কোন মানুষের নয়। ঐ যে গাছটি দেখছেন, তার ভেতর থেকেই ঐ রকম গান বাজনা ভেসে আসে।

গাছ আবার গান করতে পারে নাকি? রাজা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি গাছের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ কান পেতে রইলেন। তখন বুঝতে পেরে অবাক হয়ে অনেকক্ষণ সেই গান শুনলেন।

এদিকে পরিজাদী রাজার আহারের আয়োজন করতে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। তাকে দেখে পাখি বললো—পরিজাদী, তুমি বাগানের উত্তর পশ্চিম কোণে গিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকো। এক হাত পরিমাণ মাটি খোঁড়া হলে একটি তামার কলসী পাবে। তামার কলসীর মধ্যে দেখতে পাবে অনেক মুক্তা। সেগুলি নিয়ে এসো। পরিজাদী তখনই গিয়ে মুক্তাগুলি নিয়ে এলো। পাখি বললো—কতকগুলো মুক্তা পাচককে দাও, তাকে বলো সে যেন শশা দিয়ে মুক্তার ঘণ্ট রাঁধে।

পরিজাদী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—সে আবার কি রকম?

পাখি বললো—ঘণ্ট যে ভাবে রান্না করতে হয়, সে ভাবেই রান্না করবে। শশাগুলি গলবে, কিন্তু মুক্তা গলবে না। আমি যখন রাজাকে মুক্তার ঘণ্ট এনে দিতে বলবো, তখনই এনে দেবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্না শেষ হয়ে গেল। বাহমান ও পরভেজ রাজাকে ভিতরে নিয়ে এল। রাজাকে ঢুকতে দেখে পাখি বললো—জাঁহাপনার জয় হোক।

পাখিকে মানুষের মতো কথা বলতে শুনে রাজা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন—বাহমান আমি তোমাদের বাড়িতে এসে অনেক কিছু অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। এগুলি কি ভাবে এলো বল তো?

বাহমান বললো—জাঁহাপনা, আমাদের যা কিছু দেখছেন, তা এই পাখির দৌলতে। এমন কি আমাদের প্রাণ পর্যন্ত তার জন্য পেয়েছি।'

এই বলে সবকিছু ঘটনা রাজার কাছে বললো।

রাজা আহারে বসলেন। খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে, এমন সময় পাখি বললো—পরিজাদী, রাজাকে শশার ঘণ্ট এনে দাও।

পরিজাদী ঘণ্ট এনে দিল। ঘণ্ট মুখে দিয়ে চিবোতেই মুক্তা দাঁতে লাগলো। রাজা তখনই তা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—একি?

পাখি বললো—জাঁহাপনা, এটা মুক্তার ঘণ্ট।

রাজা বললেন—মুক্তা দিয়ে আবার ঘণ্ট হয় নাকি?

পাখি বললো—কেন হবে না? যদি মানুষের পেটে কুকুর, বিড়াল আর ইঁদুর হতে পারে তা'হলে মুক্তা দিয়ে ঘণ্ট হবে না কেন?

রাজা পাখির কথা শুনে চমকে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তা'হলে কি রানীর পেটে সত্যি কুকুর, বিড়াল আর ইঁদুর হয়নি?

পাখি বললো—না জাঁহাপনা। রানীর দু'বোন হিংসার বশে যা করেছে, তা আর মানুষ করতে পারে না।

পাখীর কথা শুনে সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। রাজা তাড়াতাড়ি প্রাসাদের দিকে গেলেন। রাজসভায় গিয়েই তিনি দু'জন অনুচরকে হুকুম দিলেন—রানীর বড় দু'বোনকে হাজির করো।

ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে দু'বোন রাজসভায় হাজির হলো।

রাজা বললেন—তোমাদের চক্রান্ত সব ধরা পড়েছে! যদি বাঁচবার আশা থাকে তবে রানীর সন্তানদের কোথায় রেখেছ বলো।

দু'বোন দেখলো, সত্য কথা না বললে রেহাই নেই। তখন বললো —জাঁহাপনা, রানীর দু'টি ছেলে আর একটি মেয়ে হয়েছিল। তাদের আমরা হাঁড়িতে করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

রাজা সে কথা শুনে দুঃখে যেমন কাতর হলেন, রাগেও তেমনি অধীর হলেন। বললেন—ওরে রাক্ষসী, তোরা এত নিষ্ঠুর!

রাজা তখনই তাদের বন্দী করবার হুকুম দিলেন। আর রানীকে নিজের হাতে মুক্ত করে নিয়ে এলেন।

রাজা তখন সমস্ত কাহিনী খুলে বললেন—রানী আমাকে তুমি ক্ষমা করো রানী বললো—জাঁহাপনা, সবই আমার অদৃষ্ট। হায়,

আমার ছেলে-মেয়েদের যদি ফিরে পেতাম।

এমন সময় রাজার সেই পাখির কথা মনে পড়লো। তিনি রানী ও কয়েকজন অনুচরসহ বাহমানের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

রাজা ও রানীকে আসতে দেখে দুই ভাই ও বোনের কি আনন্দ! বাহমান, পরভেজ ও পরিজাদীকে দেখে ও তাদের মিষ্টি কথাবার্তা শুনে রানী মুগ্ধ হয়ে গেল।

রাজা রানীকে নিয়ে যে ঘরে পাখি আছে, সেখানে উপস্থিত হলেন।

পাখি তাঁদের দেখে বলে উঠলো—রাজা ও রানী দীর্ঘজীবি হউন।

—পাখি, তোমার কথাই সত্য। আমি অপরাধীদের বন্দী করেছি। এখন জানতে চাই আমার ছেলেমেয়েরা বেঁচে আছে কিনা।

পাখি বললো—জাঁহাপনা, তারা সবাই বেঁচে আছে।

রানী ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো—তারা এখন কোথায়?

পাখি বললো—রানী, আপনার সামনেই তারা দাঁড়িয়ে আছে।

রানী সেকথা শুনে পরিজাদীকে সামনে পেয়ে তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজা জড়িয়ে ধরলেন বাহমান আর পরভেজকে।

সে কি অপূর্ব দৃশ্য! আনন্দের আবেগে সকলের চোখ জলে ভরে উঠলো। পাখি তারপর একে একে সব ঘটনা রাজা ও রানীর কাছে বললো। রাজা এরপর বিচার করে হিংসুটে দুই বোনের গর্দান নেবার হুকুম দিলেন।

গল্প শেষ হলো। শাহারজাদী বললো—জাঁহাপনা আজ রাত হবার আগেই গল্প শেষ হয়েছে। জল্লাদ ডেকে গর্দান নেবার হুকুম দিন।

শারিয়ার বললেন—বেগম, আর তোমাকে গল্প বলতে হবে না। গল্প শুনে আমার পরম তৃপ্তি হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমি অনেক শিক্ষালাভও করেছি। তুমি শুধু রূপবতী নও, তোমার মত বুদ্ধিমতী নারী আমি আর দেখিনি! গর্দান তোমাকে দিতে হবে না, তার বদলে আমার প্রধানা বেগম হয়ে তুমি থাকবে।

ভোর হবার পর রাজসভায় গিয়ে শারিয়ার ঘোষণা করলেন—এখন থেকে সবাই নিরাপদে আমার রাজ্যে বাস করবে। কোন সুন্দরী মেয়ের গর্দান আর যাবে না। রাজ্যে আবার সুখের দিন ফিরে এলো।